উৎসর্গ

পরমশ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয়ের

করকমলে



বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি ছোট গল্প একত্রিত করিয়া গ্রথিত হইল। গল্পগুলি পাঠকবর্গের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব।

শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ ("ভাস্কর")

এক-তরফা

১

মহাশয়,

আপনার ন্যায় উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী যে কখনও আমাদের এই ক্ষুদ্র শহরে পদার্পণ করিবেন, তাহা আমরা কখনও কল্পনা করিতে পারি নাই। আপনার আগমনে এখানকার আপামর সাধারণ সকলেই নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছে।

আপনার অবগতির জন্য লিখিতেছি যে, এ শহরে আমরা একটি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছি। এই প্রতিষ্ঠানটির নাম 'শিল্পকলা-বিতান'। উস্‌খুস্‌মনা এবং উড়ুউড়ু প্রাণা অনাথা কুমারী এবং বিধবাদিগের জন্যই এই প্রতিষ্ঠান। এখানে বহুবিধ শিল্পকার্য শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, যেমন—রুমালের কোণে মনোগ্রাম লেখা, বালিসের ওয়াড়ের কোণে ডি. এম. সি. সূতার ফুল তোলা, কাঁথা সেলাই করা, আলপনা দেওয়া, বড়ি দেওয়া, আচার প্রস্তুত করা, পুরাতন শাড়ীর পাড় জুড়িয়া সুজনি বা বাক্সের ঢাকনি প্রস্তুত করা, সূতাকাটা, খইভাজা, হালুয়া প্রস্তুত করা, চুল বাঁধা, আলতা পরা ইত্যাদি। এই সকল শিল্প ও কলা শিক্ষা করিয়া ইঁহারা সসম্মানে স্বাবলম্বী হইয়া সমাজের গৌরব বর্দ্ধন করিবেন, ইহাই আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা।

এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ সভা আগামী সপ্তাহে। আমাদের বিনীত অনুরোধ, আপনি এই সভায় পৌরোহিত্য করিবেন। আশা করি আমাদের এই করুণ অনুরোধ আপনি উপেক্ষা করিবেন না। আপনার সম্মতি পাইলে আপনার সুবিধা অনুসারে দিন এবং সময় স্থির করিব। সত্বর পত্রোত্তরের অপেক্ষায় রহিলাম।

আপনার একান্ত অনুগত ভৃত্য হইবার সম্মান আমার আছে—

এম. ডাট.

সেক্রেটারি

২

প্রিয় মহাশয়,

আপনার পত্র পাইয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলাম। আপনি আমাদের ঐই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্রতর অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করিতে সম্মত হইয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। আপনার ইচ্ছানুসারে আপনার পত্রে উল্লিখিত দিন এবং সময় স্থির করা হইল জানিবেন। যথাসময়ে আপনার উপস্থিতির আশায় রহিলাম।

আপনার বিশ্বস্তভাবে

এম. দত্ত

ও অনাবিল হাস্যপরিহাস এখন হইতে আমাদের ধর্ম, আমাদের চিন্তা ও আমাদের জীবনকে আনন্দ ও সার্থকতায় ভরিয়া দিবে। আশা করি আপনার এই অবসর বিনোদন আপনি অনর্থক বা নিরর্থক মনে করিবেন না।

আপনার অকপটভাবে
মণিকা দত্ত

৬

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনি সহসা এই শহর হইতে বদলি হইয়া চলিয়া গেলেন। আপনার এই স্থান ত্যাগ করিবার পূর্বে আমাদের শিল্পকলাভবন হইতে একটি বিদায়-অভিনন্দন দিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলাম না। এই প্রতিষ্ঠানের সকলেই মনে মনে এই ক্ষোভ পোষণ করিতেছেন। আপনি এখন আমাদের প্রতিষ্ঠানের সহিত অফিসিয়ালি যুক্ত নহেন, তাই আপনাকে অফিসিয়ালি সম্বোধন করিতে বাধিতেছে। আশা করি, অপরাধ লইবেন না।

আপনি যাওয়ার পর হইতেই সহসা বুঝিতেছি এ প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা এই প্রতিষ্ঠানের পেট্রন আমার কাছে কত বড। আপনাকে বাদ দিয়া এই প্রতিষ্ঠানটি আমার কাছে ক্রমশঃ স্বাদহীন, প্রাণহীন মনে হইতেছে। এমনটা তো পূর্বে কখনো হয় নাই। আপনার ব্যক্তিত্ব যেন আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। প্রতি কাজে, প্রতি চিন্তায় শুধু আপনার কথাই বেশি করিয়া মনে পড়ে। মনে হয় যেন আপনার সান্নিধ্যই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের সকলকার্যের মূল প্রেরণা। জানি না, আপনার অনুপস্থিতিতে কতদিন এই প্রতিষ্ঠানের ভার বহিতে পারিব।

দূরে চলিয়া গেলেও আমার আশা আছে, আপনি মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিয়া আমাদের প্রতিষ্ঠানটিকে উৎসাহিত করিবেন। আপনার ব্যক্তিত্ব, আপনার কথা, আপনার হাসির পরিবর্তে যেন আপনার হাতের লেখা উপদেশ ও উৎসাহবাণী আমাদিগের কর্তব্যের পথ মসৃণ ও মধুর করিয়া তোলে। ইতি

নিবেদিকা
মণিকা দত্ত

৭

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

প্রায় পনর দিন হইয়া গেল, তথাপি আপনার পত্র পাইলাম না। বড় আশা ছিল, পত্রের উত্তর পাইব। কিন্তু আমার এই ক্ষুদ্র আশাটুকু কেন পূরণ করিলেন না? আপনি কি আমাদের প্রতিষ্ঠানের প্রতি বা আমাদের প্রতি বা আমার প্রতি কোন কারণে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন? আপনার অসন্তোষ উৎপাদনের মত কিছু আমাদের প্রতিষ্ঠান, আমরা বা আমি করিয়াছি বলিয়া মনে পড়িতেছে না। হয়তো নানা কাজের ঝঞ্ঝাটে পত্রের উত্তর দিতে পারেন নাই। মনে করিয়াছিলাম, আপনার উত্তর না পাইলে আমিও আর পত্রাঘাত করিয়া আপনার মনে আঘাত করিব না। কিন্তু পারিলাম কই! আপনার কোনরূপ অসুখ-বিসুখ করে নাই তো? নূতন স্থানে, নূতন আবহাওয়া আপনার কেমন লাগিতেছে? সেখানে এমন কি পাইলেন যে যাইবা মাত্রই আমাদের প্রতিষ্ঠানকে, আমাদিগকে এবং আমাকে ভুলিয়া গেলেন? না, এরূপ ভুলিয়া গেলে চলিবে না। পত্র অবশ্য দিবেন। পত্রের আশায় পথ চাহিয়া রহিলাম। ইতি

বিনীতা
মণিকা দত্ত

৮

শ্রদ্ধাস্পদ,

পত্রের আশায় আশায় দুই সপ্তাহ কাটিয়া গেল। আমার কিন্তু খুব আশা ছিল, এবার আপনি পত্র না লিখিয়া পারিবেন না। কিন্তু বেশ পারিলেন তো! কেন, আমাদের প্রতিষ্ঠান বা আমরা বা আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে একখানা পত্রও লেখা যায় না? আপনাকে আমি অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করি, আপনি পত্র লিখুন বা নাই লিখুন, আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা দিন দিন বাড়িয়াই চলিবে। আজ হউক, কাল হউক, আপনার পত্র আমি পাইবই।

অনেকদিন আমাদের প্রতিষ্ঠানের সংবাদ আপনি পান নাই। আপনি শুনিয়া সুখী হইবেন, ইতিমধ্যে আমাদের অ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটারি অমিয়ার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের আর একটি মেয়ে সবিতার স্বামী আসিয়া তাহাকে লইয়া গিয়াছে। আগামী শুক্রবারে খই-ভাজার একটি প্রতিযোগিতা হইবে।

আপনি এখানে থাকিলে, আপনাকেই ইহার নেতা করিতাম। আপনি কত সুখী হইতেন! কিন্তু তাহা হইল না।

তবু আশা আমি ছাড়িব না। আমার এখনও বিশ্বাস আপনি আবার আমাদের প্রতিষ্ঠানের বা আমার কাছে নিশ্চয়ই আসিবেন এবং আপনার সান্নিধ্যে এবং গৌরবে আমরাও সুখী ও গৌরবান্বিত হইব। ইতি

বিনীতা
মণিকা দত্ত

৯

পুজনীয়েষু,

কই, পত্রের উত্তর তো পাইলাম না। আমার চিঠি আপনি নিশ্চয়ই পাইতেছেন. অথচ একখানি পত্রেরও উত্তব দিলেন না। ইহার কারণ বুঝিতে পারিতেছি না। কেন উত্তর দেন না, সে কথাটাও অন্তত জানাইতে পারেন।

আপনি না লিখিলেও আমি আপনাকে পত্র লিখিতেই থাকিব। আমাদের প্রতি আপনার যে সৌহার্দের পরিচয় পাইযাছি, তাহা কখনও সাময়িক বা কৃত্রিম হইতে পারে না। আমাদের জন্য আপনি চিন্তা করেন না, ইহাও অবিশ্বাস্য। আমাদের সংবাদ আপনি নিশ্চয়ই চান, আমার পত্রের জন্য আপনি নিশ্চয়ই উৎসুক হইয়া থাকেন, ইহাই আমার নিশ্চিত ধারণা। সুতরাং পত্র আমি লিখিব।

আপনি যতই নীরব রহিতেছেন, ততই যেন আপনাকে আমার আপনার জন বলিয়া মনে হইতেছে। কেন এমন হইতেছে, তাহা বুঝিতেছি না। কিন্তু হইতেছে, এটা সত্য। আপনিই বলুন, এমন মনে হওয়াটা কি দোষের? দোষ হউক আর গুণ হউক, যাহা হইতেছে তাহা সত্যই হইতেছে। ক্রমশঃই মনে হইতেছে. আপনি আমার শুধু পরিচিত দরদী বন্ধু নহেন, আপনি আমার আত্মীয়, আমার আপনার জন। আপনার কাছে যেন আমার কত দাবী। আপনার কাছে আবদার করিবার, অভিমান করিবার অধিকারও যেন আমার আছে। আপনার কি কিছুই মনে হয় না?

এ পত্রেরও উত্তর দিবেন কি না, জানি না। কিন্তু আমি আশা ছাড়িব না। পত্রের উত্তর একদিন আপনাকে দিতেই হইবে। ইতি

প্রণতা
মণিকা দত্ত

১০

শ্রীচরণেষু,

এতদিন অপেক্ষা করিলাম, ইতিমধ্যে আরো দুইখানা পত্র লিখিলাম, কিন্তু উত্তর আসিল না। এটা আমার ভাগ্য। পত্র লিখিয়া উত্তর না পাওয়া যে কত বড় দুর্ভাগ্য, তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া কেহ বুঝিবে না।

অনেকদিন আপনি আমাদের প্রতিষ্ঠানের খবর পান নাই। নিশ্চয়ই সেজন্য উৎকণ্ঠিত আছেন। কাজকর্ম একপ্রকার চলিতেছে। রেবা নামে মেয়েটিকে আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, সে আজ তিন দিন হইল, পাঁচিল ডিঙাইয়া এখান হইতে পলাইয়া গিয়াছে। এখনও কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই। ললিতা নামে একটি বিধবা এখানে ছিল, তার ভাগ্য খুব ভাল! একটি ছেলে তাহাকে বিবাহ করিয়াছে। এবারকার নিখিলভারত আচার-প্রতিযোগিতায় আমাদের এখানকার আমলকীর আচার প্রথম স্থান পাইয়া রৌপ্য পদক পাইয়াছে।

আমাদের সব খবর আপনি পাইতেছেন। কিন্তু আপনার খবর কি? আপনি কেমন আছেন, কেমন করিয়া দিন কাটিতেছে, কিছুই তো আমরা বা আমি জানিতে পারি না। আপনি কি এমনি একাই জীবনটা কাটাইয়া দিবেন? আপনার কি ইচ্ছা করে না, একজন কেহ আপনার সঙ্গে থাকুক, আপনার সঙ্গে কথা বলুক, আপনার দৈনন্দিন জীবনে সাহায্য করুক, আপনার সুখদুঃখের ভাগ নিক? আপনি চিন্তা করুন বা নাই করুন, আমাকে কিন্তু চিন্তা করিতেই হইতেছে। আপনার জীবন এমনভাবে কাটিতে পারে না। আপনার জন্য সত্যই আমার চিন্তা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। আপনিও নিশ্চয়ই ভাবেন, কিন্তু কেন যে দুই এক লাইন লিখিয়া এই ভাবনাচিন্তার লাঘব করেন না, তাহা আমার বুদ্ধির অগম্য। আচ্ছা, এবার নিশ্চয় পত্রের উত্তর দিবেন। দিবেন তো?

প্রণতা
মণিকা

১১

প্রিয় মহেশবাবু,

আপনার পত্র পাইলাম না। এটা অবশ্য নূতন কথা নয়। আমিও ক্রমাগত চিঠি লিখিয়াই চলিয়াছি। এটা ক্রমশঃ একটা পুরাতন ব্যাপার হইতে চলিয়াছে। আপনি চিঠি লেখেন না বলিয়াই আমিও লিখিব না, ইহা হইতে পারে না। কারণ

আপনি চিঠি না লিখিলেও আমার চিঠি যে পড়েন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহাই আমার চিঠি লেখার সার্থকতা। এই চিঠির ভিতর দিয়াই আমি আমাদের পরস্পরের পরিচয় ঘনিষ্ঠ করিয়া তুলিব, আপনার মৌন আমাকে মুখর করিয়াই রাখিবে।

আমাদের প্রতিষ্ঠানের খবর গত তিন চারি পত্রে অনেক দিয়াছি। তেমন নূতন খবর কিছু নাই। সুকুমারী নামে একটি মেয়ে ছিল, হয়তো আপনার মনে আছে, খুব ভাল আল্পনা দিত—তাহার বিবাহ হইয়া গেল জৌনপুরের এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে। ইণ্টার-প্রভিন্সিযাল সামাজিক মিলনে আর একটি গ্রন্থি পড়িল।

আপনাকে একটা কথা আজ একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাই। আপনি কেন একা থাকিবেন, তাহা আমি একেবারেই বুঝিতে পারিতেছি না। আপনিও একা, আমিও একা। যদি দুজনে একত্র হইয়া পরস্পরের একাকিত্ব দূর করিযা দেই, তাহাতে ক্ষতি কি? সমাজের ভযে? ওটা অমূলক। আমাদের একত্র বাসে কাহারও কোন ক্ষতি হইতে পারে না। সামাজিক আপত্তির মূলে শুধু হিংসে। লোকে মুখে বলিবে, সামাজিক পবিত্রতা, পারিবারিক শান্তি, আরো কত কি, কিন্তু আসল কথা, দুইটি মানুষ সুখী হউক বা আনন্দ লাভ করুক এটা সমাজ সইতে পারে না। তাই এত বড় বড় তর্ক। আপনার মত এবং আমার মত শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে সমাজের ভয় শোভা পায় না। এ সম্বন্ধে আপনার মতামত আমি প্রত্যক্ষে না জানিলেও পরোক্ষভাবে জানি। সুতরাং আশা করি, আপনি এবিষয়ে আর কোন দ্বিধা করিবেন না।

আমি জানি আপনি পত্রের উত্তর দিবেন না। কিন্তু আমিও আপনাকে পত্র লিখিতে এবং আপনার পূর্ণ সম্মতির জন্য অপেক্ষা করিতে বিরত হইব না। ইতি

মণিকা

১২

প্রিয় মহেশবাবু,

আপনার পত্র না পাওয়ায় আমার প্রস্তাব সম্বন্ধে আপনার মতামত জানিতে পারিলাম না। কিন্তু আমি হাল ছাড়িব না। আপনার সম্মতি আমি চাই এবং তাহা আমি পাইবই। আপনাকে পাইবার চেষ্টাই আমার জীবনের প্রধান ব্রত, প্রধান সাধনা হইযা দাঁড়াইয়াছে। আমার এ সাধনা কেন ব্যর্থ হইবে? সেকেলে

নন-ম্যাট্রিক উমা যদি তার সাধনা দ্বারা মহেশকে লাভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আধুনিক গ্রাজুয়েট (অনার্স-সহ) কেন পারিবে না? এ পর্যন্ত প্রায় আশিখানা পত্র লিখিয়াছি, প্রযোজন হইলে আটশতখানা লিখিতেও পশ্চাৎপদ হইব না।

আমার পত্র আপনি চান। তাহা না হইলে, পত্রগুলি ডেড্-লেটার অফিস হইতে ফিরিয়া আসিত। আপনি নিঃসম্পর্কীয়া মেয়ের পত্র পাইতে ও পড়িতে বেশ ভালবাসেন, অথচ উত্তর দিবার সাহস নাই। কি আশ্চর্য! একখানা পত্র বা এক লাইন উত্তরও কি আপনি দিতে পারেন না? আপনি নিশ্চিত জানিবেন, আমার একাগ্র আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই পত্র-সাধন চলিতে থাকিবে। ইতি

মণিকা

১৩

প্রিয় মহেশবাবু,

এখনও আপনি মন স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই দেখিতেছি। কেন এই দ্বিধা? বিবাহ আপনি করিবেন। সুতরাং আমাকে কেন করিবেন না, তাহা তো বুঝিতেছি না। যে কোন স্বামী নবীনা স্ত্রীর কাছে যাহা যাহা চায়, তাহার কোনটি নাই আমার? রূপে তিলোত্তমা না হইলেও সাধারণ বাঙালীর পক্ষে সুন্দরীই আমাকে বলা যায়। স্বাস্থ্য বেশ ভাল, কোন উৎকট অসুখ কখনো হয় নাই। একেবারে মূর্খ আমি নই। আর একটু খাটিতে পারিলে ফার্স্ট ক্লাস অনার্সই পাইতাম। অর্ধেক রাজত্ব অবশ্য আমার নাই, কিন্তু বাবা মৃত্যুর সময়ে সামান্য যাহা কিছু দিয়া গিয়াছিলেন, তাহা আমি ব্যয় করি নাই। তাহাতে এক সেট সোনার এবং এক সেট জড়োয়া গহনা তো হইবেই, তাছাড়া একটি ছোট নূতন বাসা সাজাইবার মত আসবাব-পত্রও হইবে। আর কি চান আপনি? ভাল চাকরি করিতেছেন, নগদ টাকার কি দরকার আপনার? যদি নিতান্ত প্রয়োজন মনে করেন, তবে কয়েক হাজার টাকা আমি সংগ্রহ করিতে পারিব বলিয়াই আশা করি। আমার এক নিঃসন্তান দূর-সম্পর্কীয় পিসেমহাশয় আছেন, আমি নিজে ধরিয়া পড়িলে কিছু না দিয়া পারিবেন না। অতএব কেন আপনি আমাকে বিবাহ করিবেন না?

আপনার মৌন আমি আর সহিতে পারিতেছি না। আপনি আপত্তি করিতেছেন না, অথচ সম্মতিও দিতেছেন না, এ কেমন কথা? আমার কোন কথা আমি বলিতে বাকি রাখি নাই। কিন্তু উত্তরে একটি কথাও কি শুনিতে পাইব না? ইতি

আপনার মণিকা

১৪

প্রিয়—'

তোমার পত্র না পাইলেও তোমার মনের কথা আমি বুঝিয়াছি। তোমার মৌন সম্মতি আমি পাইয়াছি। পত্রের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিবার ধৈর্য আমি হারাইয়া ফেলিয়াছি, তাহার কোন প্রয়োজনও আমি দেখিতেছি না।

আমি আগামী বৃহস্পতিবার এখান হইতে যাত্রা করিয়া শুক্রবার বেলা আড়াইটার সময়ে তোমাদের ওখানে পৌঁছিব। অবশ্য স্টেশনে আসিবে। অন্যথা না হয়। ইতি

তোমারই
ফুলু (মণিকা)

১৫

ওগো, কি ভয়ানক লোক তুমি! একটি মেয়ে, তোমারই স্ত্রী হবার জন্য একটা স্যুটকেস হাতে করে অচেনা স্টেশনে এসে নামল, তুমি একবার স্টেশনেও গেলে না? ট্যাক্সির বালাই এখানে নেই। ভাগ্যিস একখানা সাইকেল রিকশা পেয়েছিলুম, নইলে এই স্যুটকেস কাঁধে করে হেঁটেই আসতে হ'ত এখানে।

যাক্, তুমি খুব অখুসী হওনি দেখছি। এখন হাঁ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে না থেকে, বেয়ারাকে ডাক, স্যুটকেসটা নিয়ে ঘরে রাখুক। বিছানা-ফিছানা কিন্তু আনিনি।

আর দেখ, মানে, সমাজে যখন বাস করতে হবে, তখন একটা বিয়ে-টিয়ের ব্যবস্থা করলে মন্দ হয় না। তুমি না পার, তোমাকে কিছু করতে হবে না। আমিই চিঠি লিখে দিচ্ছি আমাদের পুরুতকে। আমার মাসিমা, মাসতুত ভাই, পিসতুত বোন আর জেঠতুত বৌদিকে লিখে দিচ্ছি এখানে আসতে।

তোমার দুচার জন আত্মীয়স্বজনকে আসতে বলা দরকার। তুমি না পার, ঠিকানাগুলো দাও, আমিই লিখে দিচ্ছি।

সামনের সাতই ফাল্গুন ভাল দিন আছে। কেমন? বেশ! এখন চল দেখি তোমার বাড়ীর ঘরটরগুলো, কোথায় কি রেখেছ, দেখে শুনে নিই। নাও ওঠ।

লগ্ন

১

অণিমা অবক্ষণীয়া হইয়া উঠিয়াছে। লেখাপড়া শিখিয়াছে, গানবাজনা জানে, গৃহস্থালীর কাজকর্ম জানে, দেখিতেও ভাল, অথচ বিবাহ হইতেছে না। ইহার মধ্যে বিশেষত্ব অবশ্য কিছু নাই। যে সকল কারণে বিবাহে বিলম্ব হয় তাহা আমরা সকলেই জানি।

অতীতে এবং বর্তমানে অনেক সম্বন্ধ আসিয়াছে এবং আসিতেছে। বয়স, গায়ের রং, আদান-প্রদান, ঠিকুজী কোষ্ঠী প্রভৃতি অসংখ্য প্রকার অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে মতানৈক্য ঘটায়, সুখদুঃখ, আদর্শ, কল্পনা, মনের মিল প্রভৃতি তুচ্ছ বিষয়গুলি কাহারও মন বা যুক্তি স্পর্শ করে না। ফলে পাত্র এবং পাত্রীর স্বাভাবিক পরিচয় ও সম্বন্ধ দূর হইতেই দূরে সরিয়া যায়।

অণিমার অভিভাবকগণের সম্মুখে সম্প্রতি দুইটি সম্বন্ধ সম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে। একটি ধনীর দুলাল, ব্যাঙ্কে অনেক টাকা, আঁকা-বাঁকা পথে চলার অভ্যাস ছাড়াইবার জন্য শীঘ্রই বিবাহ দেওয়া প্রয়োজন হইয়াছে। অপরটি চাল-চুলা-হীন বিশ্ববিদ্যালয়ের গোল্ড-মেডালিস্ট, সম্প্রতি এরও বড় ভজনে বড় আছেন। অভিভাবকগণের মধ্যে কেহ বলিলেন, ভারী ওসব গোল্ড মেডাল ফেডাল রাখ; ওসব শুনতে ভাল, বাস্তব জীবনে ওর কোন মূল্য নেই। খুড়ো শ্রেণীর অনেক ভদ্রলোক বললেন, যা বলেছ। গোল্ড-মেডাল। ক'ভরি হবে শুনি—পাঁচ, ছয়, কিংবা বড় দশ। আজকালকার বাজারেও দাম না হয় ছ'শ টাকা। আর ও-ছেলেটির শুধু কাগজেই আছে বিবানস্বই হাজার টাকার, তাছাড়া বাড়ী তিনখানা, আরো কত কি। মেসোমশাই জাতীয় এক ভদ্রলোক বলিলেন, তোমরা যাই বল, আমার মনে হয় বড়লোকের বখাটে ছেলের চেয়ে গেরস্থ ঘরের সচ্চরিত্র ছেলেই ভাল। মেয়ের সুখদুঃখটাও তো দেখতে হবে। এমনি করিয়াই নানা তর্ক ও আলোচনা চলিতে লাগিল।

এদিকে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত বিবাহের আলোচনা শুনিতে শুনিতে এবং মাঝে মাঝে রূপ গুণের পরীক্ষা দিতে দিতে অণিমার কৈশোর-সুলভ অতিলজ্জা কাটিয়া গিয়াছে। এখন অনেক সময় সে বৌদিদি প্রভৃতির সঙ্গে নিজের বিবাহ সম্বন্ধে একটু আধটু আলোচনাও করিয়া থাকে। এই দুইটি সম্বন্ধের কথা উহার কানে পৌঁছিলে অণিমা বৌদিদিকে নিভৃতে বলিল, বড়লোকের বখাটে ছেলেকে আমি বিয়ে

ক'রব না। বৌদিদি বলিলেন, হঠাৎ অমন মত দেওয়া যায় না। সংসারে সবই লাগে। ছেলেবেলাকার কল্পনারঙীন মন দিয়ে জীবনের সমস্যার সমাধান হয় না। ভাল করে ভেবে দেখ।

অণিমা বলিল, ভেবে আমি দেখেছি। ওই তো ও বাড়ীর মালতী। কত বড ঘরে বিয়ে হয়েছে। জড়োয়া জর্জেটে পরী সেজে মুখে হাসি টেনে সামাজিকতা রক্ষা করে, পূজা অর্চনা দিয়ে মনকে সান্ত্বনা দেয়, আর রোজ সকালে উঠে গ্লাস গ্লাস লেবুর রস যোগায়। এতটুকু প্রতিবাদের সাহস পর্যন্ত অবশিষ্ট নেই। আমি চাইনে ও জীবন। বরং দুবেলা ভাত রাঁধব সেও ভাল।

অরক্ষণীয়া শিক্ষিতা কন্যারাও যে 'চায়না-যাপান' থিওরি অগ্রাহ্য করিয়া স্বীয়মত ব্যক্ত করিতে পারে, ইহা দেখিয়া জ্যেষ্ঠতাতশ্রেণীর কেহ কেহ পরম বিস্ময় বোধ করিলেন। অণিমার গোল্ড স্ট্যাণ্ডার্ডের প্রতি প্রীতি দেখিয়া তাহার সখীরা অনেকেই পুলকিত হইল।

২

পৌষ মাস। এ মাসে সাধারণত বিবাহাদি নিষিদ্ধ। কিন্তু পুরোহিতঠাকুর মহাশয় মত দিলেন, অরক্ষণীয়া-পক্ষে পৌষে বিবাহ চলিতে পারে। গোল্ড মেডালিস্ট রমেন্দ্রেরও অমত নাই। রমেন্দ্রের পুরোহিত মহাশয় স্পষ্টই বলিলেন, তাঁহার দক্ষিণা ত্রিগুণ করিয়া দিলেই নবদম্পতীর পৌষ-দোষ নিরাকৃত হইবে।

বিবাহের মাস স্থির হইয়াছে। দিনও স্থির হইল, ১৭ই পৌষ। লগ্ন সম্বন্ধে কথা উঠিতেই কেহ কেহ বলিলেন, পৌষমাসে বিয়ে, তার আবার লগ্ন কি? পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, ঘাসেরও ফুল আছে, অকালেরও শুভক্ষণ আছে। পঞ্জিকা দেখিয়া লগ্ন স্থির হইল। রাত্রি দশটা সতরো মিনিট হইতে একটা আটাশ মিনিট পর্যন্ত অভয় যোগ। এই লগ্নেই অরক্ষণীয়া-বিবাহ প্রশস্ত।

বিবাহের দিন। বাটীর সম্মুখে একপার্শ্বে সানাই বাজিতেছে। একে ব্ল্যাক-আউট, তায় পৌষ মাসের শীতের সন্ধ্যা। সবাই জড়সড। খুব বেশি লোক নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। দুর্মূল্যের বাজার। নিমন্ত্রণ-পত্রের 'লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদ প্রার্থনীয়' কথাগুলি ফুটনোট হিসাবে না পডিয়া অনেকেই ওটাকে চিঠির হেডিং বলিয়াই মনে করিয়াছেন।

বাড়ীখানি তিনতলা। যুদ্ধবিগ্রহের ভয়ের জন্য উপরতলায় কোন ব্যবস্থা হয়

নাই। সকলেই নিচে নামিয়া আসিয়াছেন, বিবাহের আয়োজন, বাসর-ঘর নিমন্ত্রিতদিগের আহারের ব্যবস্থা, সবই নিচের তলায়।

গোল্ড-মেডালিস্ট বর পৌঁছিলেন। সানাই কাঁসি বাজিয়া উঠিল। হুলুধ্বনি হইল। কালো টুপি-ঢাকা আলোর নিচে বর অধিষ্ঠিত হইলেন।

জেঠামহাশয়জাতীয় জনৈক ভদ্রলোক বলিলেন, ওহে তোমাদের আশ্রয়ঘর ঠিক আছে তো? দিনকাল ভাল না।

পিসেমহাশয় গোছের এক ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, সব ঠিক আছে। শুধু হারিকেনে তেল নেই। ঘেণ্টুকে পাঠিয়েছি পাড়ায়।

একটু পরে ঘেণ্টু ফিরিয়া আসিতেই তাহাকে প্রশ্ন করা হইল, কেরোসিন তেল পাইয়াছে কিনা। সে বলিল, দুই তিনটি দোকানে বৃথা অনুসন্ধানের পর সে মিঃ ভট্টাচার্যের বাড়ী গিয়াছিল। তিনি বলিলেন, তাঁহার মাত্র ছয় টিন তেল মজুদ আছে, সুতরাং এ বিষয়ে তিনি সাহায্য করিতে পারিলেন না বলিয়া বিশেষ দুঃখিত। তারপর ঘেণ্টু যায় পদী পিসীর বাড়ীতে। তিনি বলিলেন, আজ রেখেছি এক বোতল তেল আট আনা দিয়ে। নেহাত দরকার যদি হয়, নিয়ে যা আধ বোতল। খবরদার, আধবোতল তেল যেন থাকে আমার বোতলে। নইলে কাল আমার উনুন জ্বলবে না। ঘেণ্টু আধবোতল তেল আনিয়া হারিকেনে ঢালিয়া দিল।

নিকট আত্মীয় স্বজন, নিকটবর্তী প্রতিবেশী ও বন্ধুবান্ধব এবং কয়েকজন বরযাত্রী ব্যতীত এ বিবাহে অন্য লোকসমাগম বেশি হয় নাই, হইবার কথাও নয়।

লগ্ন নিকটবর্তী হইতেই জেঠামহাশয়স্থানীয় জনৈক ভদ্রলোক হাঁকিলেন, পুরুতঠাকুর মশায়, লগ্ন হ'য়ে এল। বেশি দেরি ক'রবেন না। বর পাঠিয়ে দিন ভিতরে, স্ত্রী আচার আরম্ভ হ'ক।

দেখিতে মেসোমহাশয়ের মত এক ভদ্রলোক হাঁকিলেন, ওহে চটপট পাতা ক'রে ফেল। এক ব্যাচ এখুনি বসিয়ে দাও। একটুও দেরি ক'র না। সময়টা ভাল নয়।

স্ত্রী আচার আরম্ভ হইয়া গেল। সাতপাক প্রায় শেষ। এমন সময়ে একটা তীক্ষ্ণ বিকট হুউউ—আআআ—হুউউ—আআআ শব্দ শুনিয়া সকলেই চমকিয়া উঠিলেন। যাঁহারা পিঁড়ি ধরিয়াছিলেন, তাঁহাদের হাত কাঁপিতে লাগিল। বর এবং কনে উভয়েই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। কেহ কেহ বলিলেন, বিবাহ স্থগিত থাক। পুরোহিত ঠাকুর মহাশয় ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, সে হ'তে পারে না। তোমরা শিগ্‌গির শুভদৃষ্টি করাও। ঘেণ্টু ছুটিয়া গিয়া একটু তুলা আনিয়া বরের এবং কনের কানে ভাল করিয়া গুঁজিয়া দিল। শ্যালিকা জাতীয়া একটি মেয়ে ভিয়েন হইতে দুইখানা

গরম লুচি আনিয়া ভাঁজ করিয়া একখানি বরের মুখে এবং আর একখানি কনের মুখে গুঁজিয়া দিয়া বলিল, ভাল করে দাঁত দিয়ে চেপে রাখ।

শুভদৃষ্টি হইয়া গেল।

[redacted] যাহারা খাইতে বসিয়াছিলেন, তাঁহারা সবেমাত্র বেগুন ভাজা দিয়া একটু লুচি মুখে তুলিয়াছেন। ইতিমধ্যে সাইরেন বাজিয়া উঠায় সকলেই এক একখানি লুচি ভাঁজ করিয়া দাঁতে চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া রহিলেন। পিসেমহাশয় জাতীয় ভদ্রলোক আশ্বাস দিলেন, আপনারা আসন ছাড়বেন না। চারিদিকে ভাল দেওয়াল আছে, কোন ভয় নেই।

পুরোহিত ঠাকুর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করা হইল, এখন কি করা যায়? তিনি বলিলেন, শুভকর্ম এমন মাঝখানে হঠাৎ বন্ধ করা যায় না। আমি তা পারব না। এতে আমার ব্রতভঙ্গ হবে। আমি শেষ না ক'রে উঠছি নে, তা বোমাই পড়ুক আর যাই হোক। এই কথা বলিয়া তিনি সভাস্থ আলিপনার উপর সযত্নে-পাতা পিঁড়িতে বসিলেন। সুতরাং বর এবং কনেও সভাস্থ হইলেন। পুরোহিত ঠাকুর মন্ত্র পড়িয়া যাইতে লাগিলেন, মুখে লুচি থাকায় বরকনে মনে মনেই মন্ত্রোচ্চারণ কার্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

পুরোহিত ঠাকুর মহাশয় বলিলেন, সৌকালীনগোত্রস্য—

বাহিরে দূরে শব্দ হইল, গুম্-গুম্—দুম্-দুম্-দুম্। ব্রহ্মতেজোদীপ্ত পুরোহিত মহাশয় ব্যতীত আর কাহারও মুখে কোন কথা নাই। বাড়ীর সকলেই আশ্রয়গৃহে অথবা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। ঘেণ্টু নিঃশব্দে এঘর-ওঘর করিতেছে এবং চুপি চুপি কোথায় কাহার কি দরকার, তাহার অনুসন্ধান ও ব্যবস্থা করিতেছে। ছোট ছেলেমেয়েগুলিকে ঘুম পাড়াইবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা হইতেছে।

শঙ্কিত উদ্বিগ্নচিত্তে বর-কনে পিঁড়িতে বসিয়া আছে। পুরোহিত মহাশয় স্বকর্তব্য পালন করিয়া যাইতেছেন।

বাহিরে দূরে আবার শব্দ—গুম্ গুম্ দুম্ দুম্।

৩

ঘণ্টা দুই পরে। সমস্ত বাড়ী নিস্তব্ধ। কোথাও আলো নাই। দল বাঁধিয়া কতক আশ্রয়ঘরে, কতক সিঁড়ির নিচে, কতক অন্য অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে নিম্নস্বরে গল্প করিয়া সময় কাটাইতেছেন।

বাসর ঘর। সবই আছে, শুধু আনন্দ কোলাহল নাই। একবার একটি মেয়ে গান গাহিবার উদ্যোগ করিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে বাহির হইতে গম্ভীর শব্দ আসিল, গুম্ গুম্ দুম্ দুম্। সব উৎসাহ নিভিয়া গেল।

কেহ কেহ ঈষৎ তন্দ্রাভিভূত হইলেন, আবার কেহ কেহ বর্তমান 'পরিস্থিতি' বিষয়ক নানাপ্রকার গল্প ও আলোচনা আরম্ভ করিলেন। কয়েক দিন পূর্বে কেমন করিয়া ঘেণ্টু খাবারের দোকানে দুই পয়সার জিলিপি খাইয়া টাকা ভাঙাইতে গিয়া বারো আনার তেলে-ভাজা জিলিপি খাইতে বাধ্য হইয়াছিল, হরিশ সেদিন চিনি কিনিতে গিয়া কেমন করিয়া পায়ে খিল ধরিয়া পথের মাঝখানে শুইয়া পড়িয়াছিল, অনেকেই কেমন একটি টাকা দেখাইয়া দেখাইয়া বিনাভাড়ায় ট্রামে চড়িতেছেন, জিনিসপত্রের দুর্মূল্যতার জন্য কত পরিবারে অর্ধাশন আরম্ভ হইয়াছে, খাবারের দোকানে জিলিপি কচুরি শিঙাড়ার আকার ক্রমশঃ কেমন ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইতেছে, ব্যবসায়ীরা ঘরে মজুদ জিনিসপত্র বেচিয়া কেমন টু-পাইস করিয়া লইতেছেন, কোন কোন ব্যবসায়ী গৌরী সেনের কল্যাণে ছয় মাসেই কেমন অনাগত ছয় পুরুষের সংস্থান করিয়া লইয়াছেন, ঘিয়ে ঘিয়ের গন্ধ কেন পাওয়া যায় না, ছেলে-মেয়েরা আবার তালপাতা, কলাপাতা, শ্লেট ব্যবহারে অভ্যস্ত হইবে কি না, কোন্ রেডিওতে কে কি বলিয়াছে, কে কাহাকে কি বলিয়া শাসাইয়াছে, শাঁখারীটোলার জ্যোতিষী কি বলিয়াছেন, কলিকাল কবে শেষ হইবে, ইত্যাদি বহুবিধ সংলগ্ন ও অসংলগ্ন আলোচনা চলিতে লাগিল।

বাসরের নায়ক-নায়িকার ক্লান্ত, উদ্বিগ্ন আন্দোলিত নয়ন দুইটি মাঝে মাঝে পরস্পরের দিকে ঈষৎ আকৃষ্ট হইতেছিল। অরক্ষণীয়া অণিমা তাহার অদৃষ্টকে যুগপৎ প্রশংসিত ও ধিক্কৃত মনে করিতেছিল।

হঠাৎ ওকি! ভীষণ শব্দ! কানের পরদা প্রায় ফাটিয়া যাইবার উপক্রম। বাড়ীর মধ্যে মুহূর্তের মধ্যে যেন একটা প্রলয় কাণ্ড হইয়া গেল। উঃ! আঃ! গেলাম! আলো! একটু জল! কে আছ! ওরে বাপ্ রে! ইত্যাদি আর্তনাদে বাড়ীর ঘরগুলি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ছোট ছেলেমেয়েগুলির ভয়ার্ত ক্রন্দন আকাশে বাতাসে ছড়াইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর্যন্ত একটা ভয়াবহ মর্মান্তিক আর্তনাদ ব্যতীত আর কিছুরই অস্তিত্ব রহিল না।

এমনি করিয়া খানিকক্ষণ কাটিবার পর অল্-ক্লিয়ার বাঁশী হুউউ করিয়া বাজিয়া উঠিল। প্রতিবেশী কয়েক ব্যক্তি এবং এ. আর. পি'র যুবকবৃন্দ ছুটিয়া আসিল। টর্চ লইয়া তাহারা বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল।

বাড়ীর উপরে বোমা পড়িয়াছে। তিন তলার ছাদ ফুটা হইয়া ভাঙিয়া গিয়াছে। দোতলার ছাদ ফাটিয়া গিয়াছে। তিন তলার দরজা জানালাগুলি কাগজের মত কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। ঘরের আলমারি প্রভৃতি জিনিসপত্র ভাঙিয়া চুরিয়া গুঁড়া হইয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়াছে। পাঁচ ইঞ্চি এবং তিন ইঞ্চ পার্টিশনগুলি ভাঙিয়া গিয়াছে। দশ ইঞ্চি দেওয়াল ফুটা হইয়া গিয়াছে। পনর ইঞ্চি দেওয়ালগুলি অধিকাংশই ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে।

নিচ-তলার ক্ষতি অপেক্ষাকৃত কম। লোকজন যাঁহারা ছিলেন, কাহারও তেমন মারাত্মক আঘাত লাগিয়াছে বলিয়া মনে হইল না। তথাপি অ্যাম্বুল্যান্স ডাকিয়া সাতজনকে হাসপাতালে পাঠান হইল। কয়েকজন শক খাইয়া অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিছুক্ষণ পরে চেতনা ফিরিয়া পাইলেন। কয়েকজনের কানে তালা লাগিয়াছিল। তাঁহারা চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। বাড়ীর আলোর তার ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। আলো জ্বলিল না। গোটা দুই হারিকেন জ্বালিয়া রাখা হইল। যাহাদের অল্প প্রাথমিক চিকিৎসা প্রয়োজন, ডাক্তার আসিয়া তাহার ব্যবস্থা করিলেন।

যাঁহারা হাসপাতালে গেলেন, তাহার মধ্যে ছিলেন পুরোহিত ঠাকুর এবং অণিমা। বাসরঘরের পাশেই একটা ছোট বোমা পড়িয়াছিল। একটা জানলা বন্ধ করা হইয়াছিল একটি বইভরা আলমারি দিয়া। কিন্তু বোমার ঝাপ্‌টা এই আলমারিটি সহিতে পারে নাই। এই আলমারির নিচে পড়িয়া অণিমার একখানি পা থেতলাইয়া গিয়াছে। আলমারির একখানি কাচ ভাঙিয়া অণিমার ডান চোখে আসিয়া বিঁধিয়াছে। পুরোহিত ঠাকুর মহাশয় মাথায় একটা কঠিন আঘাত পাইয়া অচেতন হইয়া পড়িয়াছেন।

৪

কয়েক সপ্তাহ পরে। হাসপাতালে।

অণিমা আরোগ্যলাভ করিয়াছে। গোল্ডমেডালিস্ট রমেন্দ্র স্ত্রীকে লইতে আসিয়াছে। হাতে একটি কাগজের পুঁটুলি। পুঁটুলিটি হাতে লইয়া অণিমা বলিল, তুমি একটু ওদিকে যাও। রমেন্দ্র সরিয়া গেল। অণিমা হাসপাতালের নার্সকে বলিয়া বিছানার পাশে পর্দা আনিয়া, পুটুলির মধ্য হইতে একখানি শাড়ী বাহির করিয়া নার্সের সাহায্যে শাড়ীখানি পরিল। পর্দা সরাইয়া লওয়া হইলে রমেন্দ্র আসিল।

অণিমার চোখটি বাঁচান যায় নাই। ডান চোখের গহ্বরে একটা কাচের চোখ লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে। উহার বাঁ-পাখানিও অ্যাম্পুটেট করিতে হইয়াছে। খাটের পাশে একটি ক্রাচ্।

অণিমা মাথা নিচু করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, এখানা আমার ফুলশয্যার শাড়ী, জান?

তাই বুঝি আজ বেছে বেছে এই শাড়ীখানা আনতে বলেছিলে?

ইতিমধ্যে এই ওয়ার্ডের 'দিদি' আসিয়া নূতন বিচিত্র শাড়ী-পরা অণিমাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, ইউ লুক ওয়াণ্ডারফুল ইন্ দিস্ সারী!

দিস্ ইজ মাই হনিমুন-সারী, ইউ নো।

'দিদি' মিষ্ট হাসি হাসিয়া রমেন্দ্রকে বলিলেন, কন্‌গ্র্যাচুলেশন্স্। বাট টেক কেয়ার অফ হার, শী ইজ্ নাউ সো হেল্‌প্‌লেস্।

হাসপাতালের 'দিদি', 'নার্স', পরিচারিকা এবং কয়েকজন রোগীণী আসিয়া অণিমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। মিষ্ট হাসি, মিষ্ট কথা, মিষ্ট সম্ভাষণের মধ্যে তাহারা হাসপাতাল হইতে বাহির হইল।

অণিমার বাঁ-বগলের নিচে ক্রাচ। ডানহাতে রমেন্দ্রের কাঁধ ধরিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া হাসপাতালের গেটের কাছে আসিয়া ট্যাক্সিতে উঠিল। ট্যাক্সিতে বসিয়া অণিমা বলিল, একটা দুঃসংবাদ আছে।

কি?

পুরুতঠাকুর মশায় কাল মারা গেছেন!

তাই নাকি? আমি তাঁর কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করব ভেবেছিলাম, কিন্তু তোমার কথা ভাবতে ভাবতে—

যাও! আমাদের মিলন-গ্রন্থি বাঁধতে গিয়ে তিনি চিরদিনের মত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হ'লেন।

এই কথা বলিতে বলিতে অণিমার বাঁ-চোখের কোণে একটা বড় জলের ফোঁটা টলটল করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রমেন্দ্র পকেট হইতে একখানি টেলিগ্রাম অণিমার হাতে দিল। অণিমা পড়িল, অ্যাপয়েণ্টেড। জয়েন অ্যাট ওয়ান্স্। এলাহাবাদ শুগার ফ্যাক্টরি।

অণিমার মুখে একটি স্নিগ্ধ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। বলিল, তুমি চাকরি পেয়েছ?

গোল্ডমেডালিস্ট রমেন্দ্র অভিভূত-নেত্রে চাহিয়া দেখিল, তাহার নবপরিণীতা কানা ও খোঁড়া অণিমার চঞ্চল বাঁ-চোখের কোণে এক ফোঁটা জল পদ্মদলের কোণে শিশির বিন্দুর মত তখনও টলটল করিতেছে।

ট্যাক্সি চলিয়াছে। দুই পাশের ঘরবাড়ী দোকান পিছনে ছুটিয়া সরিয়া যাইতেছে। মৃদু আন্দোলনে দুইটি তরুণ যাত্রীর জীবনপথের নূতন যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। কিছুক্ষণ নীরব থাকিবার পর অণিমা বলিল, একটা কথা বলব?

কি কথা?

বলতে বড় সঙ্কোচ হচ্ছে।

আমার কাছেও সঙ্কোচ?

তোমার কাছে বলেই তো সঙ্কোচ।

তুমি কি বলবে বল। লজ্জা করবার কোন দরকার নেই।

দেখ, আমার ভয় হয়, তোমার এই নূতন জীবনের পথে আমার মত একটা কানা আর খোঁড়া স্ত্রী তোমার জীবনসঙ্গিনী না হ'য়ে একটা মস্ত ভার হ'যে দাঁড়াবে।

এতক্ষণ বুঝি ভেবে ভেবে এই দুশ্চিন্তা মাথায় ঢুকেছে?

এটা কি চিন্তার কথা নয়?

নিশ্চয়, ভয়ানক চিন্তার কথা, মানে, ভীষণ দুশ্চিন্তার কথা।

যাও! তুমি ঠাট্টা করছ।

ঠাট্টা করাই আমার অভ্যাস। চিরদিন তোমায় আমি ঠাট্টাই করব।

চিরদিন?

হ্যাঁ, চিরদিন।

ট্যাক্সি আসিয়া বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইল।

জানুয়ারী, ১৯৪৩

কিছুতেই না

পিসিমা বলিলেন, বাবা শিশির, এবার একটা বিয়ে থা কর। শিশির স্পষ্ট জবাব দিল, কিছুতেই না। এসব কথা অনেকবার হয়ে গেছে। বার বার সকলে মিলে আর বিরক্ত করো না।

এটা তোর ভারি অন্যায়। লেখাপড়া শেষ করেছিস, একটা চাকরিও করছিস, অথচ বিয়ে করবি নে, এর কোন মানে হয়? কি রকম মেয়ে তুই চাস বল তো? ঠিক তোর মনের মত ক'নে আমি খুঁজে বার করবো।

কোন রকম মেয়েই আমি চাই নে। মোট কথা বিয়ে আমি করবো না—তা তোমরা যতই জ্বালাতন করো।

আচ্ছা, ওই মহেশ ভটচায্যির মেয়েটিকে দেখেছিস বোধ হয়। দেখতে শুনতে বেশ ভাল, লেখাপড়াও জানে—

কোন ভটচায্যি দিগ্গই আমার দরকার নেই। তোমরা ওসব কথা আর তুলো না। বিয়ে-টিয়ে ব্যাপার আমার একেবারেই পছন্দ নয়। এই তো সব দেখছি, ঝগড়া-ঝাঁটি, অভাব-অভিযোগ, রোগ-শোক, কেন আর সাধ করে এর মধ্যে মাথা দেওয়া?

কিন্তু সবাই তো দিচ্ছে।

না, সবাই দিচ্ছে না। দেশে কত সাধুসন্নেসী আছে, তারা তো বেশ আছে বিয়ে না করে।

ওমা গো, শেষে কি তুই সন্নেসী হবি, ঠিক করেছিস্? তোর মা-বাবা এত আশা করে তোর মুখ চেয়ে আছে—

না গো না! কি যে বল তার ঠিক নেই। সন্নেসী কেন হব? সন্নেসী না হয়েও একা থাকা যায় না বুঝি?

যাক আর না যাক, তোর বিয়েতে এত আপত্তি কেন?

আবার ঐ এক কথা?

বিয়ে তো করবিই বাপু। তা সময়মত দেখে শুনেই করা ভাল না?

তুমি দেখে নিও, আমি ওর মধ্যে নেই। বিয়ে আমি করবো না, কিছুতেই না।

এমনি কথা ও আলোচনা কিছুদিন হইতে শিশিরদের বাড়ীতে চলিতেছে। পিসিমার সহিত এবং শিশিরের অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয় ও আত্মীয়াদের সঙ্গে বহুবার হইয়াছে। শিশির ত্যক্ত-বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

একদিন শিশির একটি স্যুটকেস ও ছোট একটি বিছানা গুছাইয়া লইয়া গৃহত্যাগ করিল। বাড়ীতে বলিয়া গেল, তোমরা যেমন উত্যক্ত করে তুলেছ, তাতে এখানে আমি আর টিকতে পারছি নে। যাই, দিন কতক মামার বাড়ী ঘুরে আসি।

২

মামার বাড়ী। খাসা বাড়ী। তবে পল্লীগ্রামে।

শিশির বহুদিন পরে মামার বাড়ী আসিযাছে। সে পাস করিযাছে, চাকুরিও পাইয়াছে। প্রথম সাক্ষাতেই সকলেই বহুপ্রকার 'কন্‌গ্রাচুলেশন' বর্ষণ করিলেন। তারপর—তারপর মামার বাড়ীতে যাহা হইযা থাকে, তাহাই হইতে লাগিল। আহার নিদ্রা, বিশ্রাম, খেলাধূলা, মাছধরা, গল্পগুজব, হাসি-ঠাট্টা প্রভৃতিতে দিনগুলি বেশ মামার বাড়ীর মতই কাটিতে লাগিল। বয়স্ক শিশির কখনো কখনো বালকের মত আবদার করে, মামীমা তাহা সহাস্যবদনে পূরণ করেন, কেন-না এটা মামার বাড়ী বই তো নয। নিজের বাড়ীতে অবশ্য সে এমন আবদার করিবে না, করিলেও কেহ আমল দিবে না।

কযেকদিন বেশ কাটিয়া গেল। একদিন বিকালে হঠাৎ শিশিরের হাত-পা বেশ ঠাণ্ডা হইয়া সর্বাঙ্গ কাঁপিযা উঠিল। একটু পরেই শীতে ঠকঠক করিতে করিতে মামীমাকে ডাকিয়া বলিল, ভীষণ জ্বর আসছে মনে হচ্ছে।

তাই নাকি? ম্যালেরিযা বোধ হয।

মামীমার কথাটার ভাবটা যেন এই, ও একটু পিঁপড়ের কামড়ের মত ব্যাপার, যেমন সহজ তেমনি স্বাভাবিক! তিনি শিশিরকে সঙ্গে করিযা লইযা বিছানায় শোওযাইয়া দিলেন এবং খান তিনেক লেপ আনিযা সর্বাঙ্গ ঢাকিযা দিলেন।

ম্যালেরিয়ার বিবরণ দিযা আর কি হইবে? কযেক দিন ভুগিয়া এবং পরম সুস্বাদু কুইনাইন মিক্‌শ্চার গলাধঃকরণ করিয়া শিশিরের মামার বাড়ীর শখ প্রায মিটিয়া আসিয়াছে। একদিন বিছানায শুইয়া অস্বস্তিতে এপাশ-ওপাশ করিতেছে, এমন সময় একটি তরুণী আসিয়া আস্তে আস্তে বিছানার পাশে বসিয়া পাখা হাতে করিয়া বলিল, একটু বাতাস করব?

কে আপনি?

আপনি! হিঃ হিঃ। আমি কমলা। আপনার মামীমা আমার মাসিমা, বুঝলেন? আজ এসেছি। এসেই শুনলাম, আপনার অসুখ, তাই দেখতে এলাম।



আপনাকে আগে একবার এখানেই দেখেছি, সেই যেবার খুব দুর্ভিক্ষ হ'ল, গাঁয়ের লোক সব গাঁ ছেড়ে শহরে পালাতে লাগল।

আমার কিন্তু মনে নেই!

আমার কিন্তু খুব মনে আছে। আপনি কত গল্প করতেন!

ও!

আপনি চুপ করে শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করুন! অত ছটফট করবেন না। আমি আপনাকে বাতাস করছি।

শিশির ঘুমাইয়া পড়িল।

মামীমা, কমলা ও কুইনাইন, এই তিনের সাহায্যে শিশির সারিয়া উঠিল। সারিয়া উঠিয়াই শিশির মামীমাকে বলিল, মামীমা, আর না। এবার চলি। আর একবার যদি ম্যালেরিয়ায় ধরে তাহলে আর বাঁচব না।

ষাট বাছা, ওকথা বলতে নেই। এখনি যাবে কেন? এতদিন পরে এসে এ কয়দিন তো বিছানাতেই কাটল। ইচ্ছেমত যে ভালমন্দ রেঁধে খাওয়াব তা হলো না। আর কটা দিন থেকে যাও। শিশির অগত্যা আর এক সপ্তাহ থাকিতে সম্মত হইল।

দিন দুই পরে একদিন দুপুরে শিশির একটু গড়াইতেছে, এমন সময়ে মামীমা আসিয়া পাশে বসিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, শরীরটা বেশ ভালই আছে?

হ্যাঁ, তবে খুব দুর্বল মনে হয়।

তা হবেই তো বাছা। তা—হ্যাঁ, একটা কথা কদিন থেকে বলব বলব মনে করছি, অথচ বলা হচ্ছে না।

কি কথা মামীমা?

না, তা কথা এমন কিছু না। বলছিলুম কি, আমাদের কমলাকে তোমার কেমন লাগে?

তার মানে?

মানে আবার কি? ওরা চাটুয্যে বংশ, মেয়েটি দেখতে সুন্দরী, লেখাপড়াও মন্দ শেখেনি, আসছে বছর নাকি ম্যাট্রিক দেবে।

তাতে আমার কি?

না, অই বলছিলুম। একটু আভাস পেলে না হয় তোমার মাকে চিঠি লিখতুম।

দেখ মামীমা, ওসব কথা একেবারে তুলবে না।

কেন, বয়স হয়েছে, সংসারী হবি নে?

সংসারী তো হয়েছি, কিন্তু ওসবের মাঝে আমি নেই।

ওমা, সে কি!

কেন? এতে আশ্চর্য হবার কি আছে! কত লোক আছে, যারা বিয়ে করেনি। আমিও করব না। তাছাড়া ওসব ঘ্যান-ঘ্যান, প্যান-প্যান আমার একেবারেই ভাল লাগে না।

ওসব কথা সবাই বলে। একটু ভেবে দেখ। জানাশোনা ঘর, সব দিক দিয়েই বেশ মানাবে।

মানাবে কি না মানাবে সে কথা চিন্তা করে কোন লাভ নেই, কেন না ওসব ব্যাপারের মধ্যে আমি নেই।

একটু দেখ না ভেবে-চিন্তে। আজই না হ'ল, কাল ভেবে-চিন্তে আমাকে বলো।

আমি এখনই বলে দিচ্ছি, ওসব কিছুতেই হবে না।

পরদিন প্রাতঃকালে দেখা গেল, শিশির ঘরে নাই। তার স্যুটকেশ-বিছানাও নাই। খাটের উপর সামনেই একখানি পত্র পড়িয়া আছে। মামীমার নামে ঠিকানা লেখা।

মামীমা পত্রখানি পড়িলেন।

শ্রীচরণেষু,

আমি এ কযদিন আপনাদের যে স্নেহ ও আতিথেয়তা পাইযাছি, তাহার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। কিন্তু শেষের দিকটায আপনাদের ব্যবহার আমার মোটেই পছন্দ হয নাই। তাছাড়া ম্যালেরিযায ভুগিযা শরীরটাও খারাপ হইযাছে। দিন-কয়েকের জন্য পুরী চলিলাম। আশা করি, আপনারা কিছু মনে করিবেন না। ইতি—

প্রণত শিশির

৩

পুরীর সমুদ্রতীরে সী-ভিউ হোটেলে আসিযা উঠিযাছে শিশির। অনন্ত প্রসারিত নীলাম্বুরাশি, তীরদেশে উচ্ছল ফেনিল তরঙ্গাঘাত, মৃদুমন্দ স্নিগ্ধ সমীরণ, সমস্ত মিলিযা শিশিরের রোগমুক্ত শরীরটিকে সুস্থ ও পুলকিত করিয়া তুলিল। সকাল সন্ধ্যায সমুদ্রসৈকতে ভ্রমণ, মধ্যাহ্নে সমুদ্রস্নান ও অবসর সমযে হোটেলবাসীদিগের সহিত বিশ্রম্ভালাপ, এই তো শিশিরের দৈনন্দিন কাজ।

একদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে শিশির একটি বালুস্তূপের উপর বসিয়া নিকটবর্তী

ছোট ছোট ঝিনুক লইয়া খেলিতেছে, এমন সময়ে একটি প্রৌঢ় আসিয়া পাশে বসিলেন। শিশিরের পাশে একখানি বই পড়িয়াছিল, সেখানি হাতে তুলিয়া বলিলেন, ও মহাত্মা গান্ধীর জীবনী। আপনি বুঝি মহাত্মার ভক্ত?

না, না, আমি কারোর ভক্ত নই। তবে হ্যাঁ, মহাত্মাজীকে আমার খুব ভাল লাগে।

তা বেশ! কতদিন এখানে আসা হয়েছে?

এই দশ বারো দিন।

তা বেশ। কোথায় থাকা হয়?

এই সী-ভিয়ু হোটেলে।

তা বেশ। আর কতদিন থাকা হবে?

ঠিক নেই। যে ক'দিন ভাল লাগে।

তা বেশ।

ভদ্রলোকটি বেশ আলাপী। কয়েক মিনিটের মধ্যেই শিশিরের নাম-ধাম প্রভৃতি সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। শিশিরও বিদেশে অযাচিত বন্ধুত্ব পাইয়া খুব খুসী হইল। শিশির জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কোথায় থাকেন?

এই তো স্বর্গদ্বারে। ওখানে একটি অনাথ-আশ্রম আছে। তারই তত্ত্বাবধান করি। যাবেন একদিন। আহা! দেখলে আপনার কষ্ট হবে। কত দুর্যোগে পড়ে, কত লাঞ্ছনা পেয়ে এরা এখানে এসে পড়েছে। আমরা আর কতটুকুই বা পারি সাহায্য করতে। আপনারা পাঁচজনই তো ভরসা।

এখানে বাঙালী আছে?

সবই তো বাঙালী! বাঙালীরাই তো এ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছে।

আচ্ছা যাব একদিন দেখতে।

নিশ্চয়ই যাবেন। আপনাকে অভয় দিচ্ছি, আপনার কাছে চাঁদা চাইব না। এসেছেন বেড়াতে, শরীর সারাতে, চাঁদা চেয়ে আপনাদের বিরক্ত করব না। তবে হ্যাঁ, ইচ্ছে করে যদি কিছু—, সে আলাদা কথা।

সে কথা থাক। এই বিদেশে আপনারা যে এমন একটা মহৎ কাজ করে আমাদের সমাজের কত উপকার করছেন, সে কথা দেশের লোকে নিশ্চয়ই শতমুখে স্বীকার করবে।

ও কথা থাক। আসবেন একদিন।

নিশ্চয়ই।

আপনাকে রোজই দেখি বেড়াতে। একদিন আমিই নিয়ে যাব ধরে।

বেশ তো।

কয়েকদিন পরে। সকালের ভ্রমণ শেষ করিয়া শিশির হোটেলে ফিরিতেছে, এমন সময়ে অনাথ-আশ্রমের সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি শিশিরকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, এই যে শিশিরবাবু, চলুন আমার সঙ্গে, আশ্রমটা দেখিয়ে আনি।

এখনই ?

তাতে কি ? চলুন না। এই তো মাত্র কয় মিনিটের পথ।

অনাথ-আশ্রমে পৌঁছিয়া সরোজবাবু অর্থাৎ উক্ত প্রৌঢ় ভদ্রলোক শিশিরকে সঙ্গে করিয়া সব দেখাইতে লাগিলেন। কোথাও কতকগুলি ছোট ছেলে একটি শিক্ষকের কাছে পড়াশুনা করিতেছে, কোথাও কতকগুলি মেয়ে অনেকগুলি কাটা কাপড় লইয়া নানাপ্রকার শেলাইয়ের কাজ করিতেছে। এইরূপে আশ্রমের অধিবাসীরা বিবিধভাবে সৎ জীবন যাপনের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। দোতলার একটি ঘরের বারান্দায় পৌঁছিয়াই শিশির দেখিতে পাইল, একটি সুন্দরী তরুণী একটি চরকার পাশে বসিয়া আছে। তুলা সূতা এবং চরকা ঘুরান দেখিয়া মনে হয় না যে সে সত্যই সূতা কাটিতেছে। সরোজবাবু বলিলেন, মেয়েটি খুব ভাল, খুব গান্ধী-ভক্ত।

তাই নাকি ?

আপনিও তো গান্ধী-ভক্ত।

কি যে বলেন !

মেয়েটি একটু লজ্জিত হইয়া চরকা ঘুরাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

সরোজবাবু বলিলেন, আহা, মেয়েটির কি দুর্ভাগ্য। কয়েকটি দুষ্টলোকে ওদের বাড়ী লুঠ করে ওকে ধরে নিয়ে কলকাতায় চলে আসে। তারপর অনেক কষ্টে উদ্ধার করে এখানে আনা হয়েছে। উঃ, সে সব দীর্ঘ ইতিহাস আর ঘটনাবলী শুনলে পাষাণও গলে যায়।

থাক, আর সে সব কথা তুলে কি হবে ? ভগবান করুন, ওর ভবিষ্যৎ জীবন আপনাদের চেষ্টায় সুখশান্তিময় হয়ে উঠুক।

আশীর্বাদ করুন, তাই যেন হয়। ওরা খুব ভাল বামুন, ওদের বংশের কত নাম।

আহা ! নিয়তির কি নিষ্ঠুর লীলা !

সরোজবাবু মেয়েটিকে বলিলেন, এঁকে প্রণাম কর। ইনি অতি মহৎ লোক। এঁর কথাই এ কয়দিন তোমাকে বলছিলাম।

মেয়েটি কাছে আসিয়া সসম্ভ্রমে শিশিরকে প্রণাম করিল। শিশির, আহা থাক,

থাক, বলিয়া প্রণাম লইয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইল। বলিল, আশীর্বাদ করি, তুমি সুখী হও।

শিশির তারপর সরোজবাবুকে একটু তাড়াতাড়ি বলিল, দেখুন, বেশ বেলা হয়েছে। এবার ফেরা যাক। এখন গিয়েই একটু সমুদ্রে নামবো, তারপর খেতে হবে। দেরী হ'লে, হোটেলের ঠাকুর-চাকরগুলো খিটমিট করবে।

শিশির হোটেলে ফিরিল।

সেইদিনই বৈকালে সরোজবাবু আসিয়া পুনরায় শিশিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। একটু ভণিতা করিয়াই আশ্রমের গান্ধী-ভক্ত মেয়েটির কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, মেয়েটিকে আপনার কেমন লাগল?

মানে?

না, মানে, আপনার পছন্দ হয় কি? খাসা মেয়েটি কিন্তু। আহা! ভাগ্যদোষে এই অবস্থা, নইলে—।

তা, আমি আর কি করতে পারি বলুন?

কেন, ইচ্ছে করলে আপনি ওর সব দুঃখই দূর করতে পারেন।

মানে?

মানে, ধরুন, যদি, মানে আপনি যদি ওকে বিয়েই করে ফেলেন?

কি বলছেন আপনি!

কেন, আপনার হৃদয় উচ্চ, মহৎ, উদার। আপনারা যদি এটুকু না করেন, তাহলে দেশের আশা কোথায়? তাছাড়া, অতি সদ্বংশের মেয়ে; আহা, কি সুন্দর দেখতে, যেন লক্ষ্মীপ্রতিমা।

দেখুন ভাল, মন্দ, উদার, অনুদার ওসব কথাই উঠছে না। মোট কথা, বিয়ে-টিয়ের মত আমার একেবারেই নেই।

কেন, বলুন তো?

কেন টেন নয়। ওরা দূর থেকেই ভাল। আমি ওদের কাছে যেতে চাইনে।

কি যে বলেন! আপনি দেখছি একেবারে ছেলেমানুষ। আপনি কি সন্নেসী হবেন?

কেন, সন্নেসী হব কেন?

তবে বিয়ে করবেন না কেন? আপনাদের মহাত্মাও বিয়ে করেছিলেন।

দেখুন, তর্ক করে লাভ নেই। মোট কথা, বিয়ে আমি করব না, ওসব সম্পর্কেই আমি থাকবো না।

একটু ভেবে-চিন্তে মত দেবেন। এমন ঘরের এমন মেয়ে, শেষে সাধ্য-সাধনা করেও হয়তো জুটবে না।

আঃ, কি বলেন আপনি! আমি ওধার দিয়েও ঘেঁষবো না! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

আমি আর নিশ্চিন্ত থাকতে পারছি কই। এতগুলি অনাথ-অনাথার কথা ভগবান আমাকে ভাবতে দিয়েছেন—নিশ্চিন্ত আর থাকতে পারছি কই। তবে আপনার মতি-গতি দেখে আপনার সম্বন্ধেও একটু উদ্বেগ বোধ করছি।

থাক, আপনাকে আর উদ্বেগের মাত্রা বাড়াতে হবে না।

আচ্ছা, আজ চললুম। একটু ভেবে দেখবেন কিন্তু।

আসুন, নমস্কার।

পরদিন শিশির হোটেলের ম্যানেজার মহাশয়কে বলিল, আমার বিলটা এখুনি পাঠিয়ে দেবেন অনুগ্রহ করে।

কেন, আজই?

হ্যাঁ, এখুনিই। ভেবেছিলাম, এখানেই ছুটিটা কাটাবো। কিন্তু, আর ভাল লাগছে না। এবার কয়দিন একটু দূরে চলে যাব মনে করেছি। দিন কয়েক বৃন্দাবনে গিয়ে থাকব মনে করেছি।

ম্যানেজার বাবুর কোন আপত্তি ছিল না। কেননা, হোটেলে এত ভিড়, এখানে আসিবার জন্য এত লোক ব্যস্ত যে, একজন যাইবামাত্রই আর একজন সে স্থান দখল করে। তিনি বলিলেন, বেশ তো যান কিছুদিন বৃন্দাবন। সেও এই শ্রীশ্রীমহাপ্রভু জগন্নাথদেবের কৈশোর ও যৌবনের লীলাভূমি। আহা! এই পোড়া হোটেলের ঝামেলা যদি না থাকতো, তা হ'লে আমিও আপনার সঙ্গে চলে যেতাম।

সে কি কথা! আপনি গেলে যে হোটেলই অনাথ হয়ে যাবে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, যা বলেছেন। আচ্ছা, দিচ্ছি আপনার বিল পাঠিয়ে।

৪

বৃন্দাবন। এই সেই শ্রীনন্দনন্দন অষ্টোত্তরশত নামধারী গোপীমনতস্কর গীতাগায়ক শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি! শিশির এখানে পৌঁছিয়াই একটি পাণ্ডা সহযোগে একটি ধর্মশালায় আসিয়া আশ্রয় লইল। মনে ইচ্ছা এই যে, যদি দুই তিন দিনের মধ্যেই ফিরিতে হয় তবে এই ধর্মশালাতেই কাটাইয়া দিবে, নচেৎ পরে একটা হোটেল বা অনুরূপ ব্যবস্থার চেষ্টা করা যাইবে।

ধর্মশালাটি মন্দ নয়। বেশ বড় এবং পরিচ্ছন্ন। একটি ঘরে জিনিসপত্র রাখিয়া একটু বিশ্রাম করিয়া শিশির অনুচর পাণ্ডাটিকে বলিল, আজ আমি ভয়ানক ক্লান্ত। এখন গিয়ে যমুনায় স্নান করব, তারপর কিছু খেয়ে একবার ঘুমোবো। আজ আর কোথাও বেরুবো না।

পাণ্ডাজী বলিলেন, বেশ, আপনার যাহা ইচ্ছা।

ঘরে তালা লাগাইয়া শিশির পাণ্ডার সহিত যমুনার ঘাটে স্নান করিতে গেল। সেখানে পৌঁছিয়া দেখে, গোপীরা তো জলকেলি করিতেছেন না, করিতেছেন একপাল কচ্ছপ। শিশির ভয়ে জলে নামিতে চায় না। পাণ্ডাজী বলেন, কোন ভয় নেই, আপনি নেমে যান, ওদের সব রাধা-ভাব কিনা, কাউকে কিছু বলে না।

রাধা-ভাব! কচ্ছপের আবার রাধাভাব?

কি যে বলেন আপনি! আপনি একেবারে নাস্তিক।

যাই বল, আমি ও কচ্ছপের ঝাঁকের মধ্যে কিছুতেই নামবো না। তুমি যাও, একটা ঘটি-টটি যোগাড় করে নিয়ে এস।

পাণ্ডাজীর আনীত ঘটির সাহায্যে কোন-মতে স্নান সারিয়া শিশির উপরে উঠিয়াছে, এমন সময়ে পাণ্ডাজী বলিলেন, কিছু ফলদান করবেন না?

ফল পাবো কোথায়?

আমি এনে দিচ্ছি।

পাণ্ডাজী কয়েকটি ছোট ছোট কলা আনিয়া দিলেন। শিশির একটি একটি করিয়া সেগুলি জলের মধ্যে ছুঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল, আর কচ্ছপগুলি হাঁ করিয়া সেগুলি গিলিতে লাগিল। একবার একটি কলা ছুঁড়িতেই কোথা হইতে একটি হনুমানের বাচ্ছা আসিয়া একটি কচ্ছপের পিঠের উপর লাফাইয়া পড়িল এবং কচ্ছপটির মুখের নিকট হইতে কলাটি খপ করিয়া তুলিয়া লইয়া নিজের মুখের মধ্যে পুরিয়া কচ্ছপটির পিঠের উপরেই নিশ্চিন্তমনে বসিয়া পুনরায় কলা নিক্ষেপের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কচ্ছপটি কোন আপত্তি করিল না। রাধা-ভাব কি না!

ধর্মশালায় ফিরিয়া পাণ্ডাজী-আনীত কিছু পুরী তরকারী ও মিঠাই খাইয়া শিশির দরজা বন্ধ করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। ভীষণ ক্লান্ত হইয়াছে এই লম্বা পথ ট্রেনে আসিতে। পাণ্ডাজী বাড়ী যাইবার সময়ে আশ্বাস দিয়া গিয়াছে, এখানে আপনার কোন ভয় নাই। এখানকার সবাই রাধা-ভাবে থাকে। দাড়িগোঁফওয়ালা দরওয়ান থেকে শুরু করে হনুমান কচ্ছপ পর্যন্ত সবারই শ্রীরাধা-ভাব। সাধারণ নরনারীর তো কথাই নেই। এখানে আপনিও রাধা, আমিও রাধা, বুঝলেন?

শিশির ঠিক বুঝিল বলিয়া মনে হইল না। দুই তিন দিন হইতে কি ট্রেনে, কি স্টেশনে, কি পথে, কি ঘাটে কোথাও তো একটা সাধারণ মেয়েলীভাবও চোখে পড়িল না—শ্রীরাধা-ভাব তো দূরের কথা। চারিদিকে সবই রীতিমত কাঠখোট্টা। যাকগে, এখন শিশির একটু ঘুমাইতে পারিলে বাঁচে।

শিশির শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল। লম্বা লম্বা নিঃশ্বাস বহিতেছে, বোধহয় একটু একটু নাকও ডাকিতেছে। এমন সময়ে ধর্মশালার মধ্যে একটি কোণের ঘরের সম্মুখে একটা গোলমালের শব্দ উঠিল। এই গোলমালের মধ্যে যেন একটা মেয়ের করুণ গলা শোনা যাইতেছে। শিশিরের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিল। এপাশ-ওপাশ করিয়া বাহিরের শব্দ উপেক্ষা করিয়া ঘুমটাকে বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু অসময়ের এই চেষ্টাকৃত ঘুমের গভীরতা খুব বেশী কখনই হয় না। শিশির চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া বসিল এবং দরজা খুলিয়া আস্তে আস্তে বাহিরে আসিয়া যে দিক হইতে গোলমাল আসিতেছিল, সেইদিকে চাহিয়া দেখিল।

শিশির যাহা দেখিল তাহা সম্যক বর্ণনা করা অসম্ভব। অপরূপ সুন্দরী, অসামান্য লাবণ্যবতী একটি তরুণী। কাঁচা সোনার মত বর্ণ, চোখ, মুখ, নাক, হাত, পা যেন কোন শিল্পী পাথর হইতে কুঁদিয়া অতি সযত্নে গড়িয়া তুলিয়াছে। সমস্ত ধর্মশালাটি যেন আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। শিশির মনে করিল, ইনিই কি এখানকার শ্রীরাধা। বৃন্দাবনের কচ্ছপ দেখিয়া উপহাস করিয়াছিলাম, তাই বুঝি নারায়ণ স্বয়ং লক্ষ্মীকে পাঠাইয়া দিয়াছেন আমার ভুল ভাঙিতে। এই তো স্বয়ং লক্ষ্মী অথবা লক্ষ্মীর সাক্ষাৎ অবতার শ্রীরাধা। শিশির মুগ্ধ ও তন্ময় হইয়া গেল।

কিন্তু শিশিরের এই মুগ্ধতা ও তন্ময়তা স্থায়ী হইতে পারিল না। কারণ গোলমালটাও থামিল না এবং শিশির দেখিতে পাইল, মেয়েটি ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করিয়া কাঁদিতেছে। আর, কয়েকটি পাণ্ডা-গোছের লোক উচ্চৈঃস্বরে এবং অতি নিম্নস্বরে নানাপ্রকার সান্ত্বনা দিতেছে।

শিশির ভাবিল, ইনি যদি শ্রীরাধাই হবেন, তা হলে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কাঁদছেন কেন? শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতে তো শ্রীরাধার ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কান্নার কথা লেখা নেই।

যাই হোক, শিশির একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইয়া দেবীর নিকটবর্তী হইল। তাহাকে দেখিয়া মেয়েটি কান্না থামাইয়া তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল। কোঁচা দেওয়া ধুতি দেখিয়াই বোধহয় বুঝিতে পারিল, শিশির বাঙালী। শিশিরও যেন কেমন মনে মনে বুঝিতে পারিল, মেয়েটি বাঙালী। বিদেশে বাঙালী-বাঙালী বা বাঙালী-

বাঙালিনীর সাক্ষাৎ ও পরিচয় যে কত মধুর তাহা বাংলাদেশে বসিয়া কল্পনা করা যায় না।

শিশির আর একটু অগ্রসর হইয়া দেবীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আপনি কাঁদছেন কেন?

এই কথা শুনিযাই মেয়েটি আবার ভীষণ ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ শব্দে কান্না আরম্ভ করিয়া দুই হাত দিয়া মুখ ঢাকিয়া ফেলিল।

আপনি এমন করে কাঁদবেন না। কি হয়েছে বলুন না।

এ অভাগিনীকে আর আপনি বলবেন না।—বলিযাই আবার উচ্ছ্বসিত কান্না। মাঝে মাঝে এক হাত দিয়া পাশের পুঁটুলিটিকে সযত্নে পাশে চাপিয়া রাখিতেছে এবং ফোঁস ফোঁস করিয়া পাশের পাণ্ডাগুলিকে কি বলিতেছে।

শিশির পাণ্ডাদিগকে প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিল, মেয়েটি ব্রাহ্মণ-কন্যা। ইহার নিবাস কলিকাতায়, সম্ভ্রান্ত অথচ দরিদ্র ঘরে জন্ম। পিতা-মাতা নাই। পিসিমা ইহাকে মানুষ করিয়া নিজের কাছে রাখিযাছিলেন। পিসিমা ও পিসেমশায় তীর্থ করিতে বৃন্দাবন আসিয়াছিলেন। সঙ্গে মেয়েটিকেও লইয়া আসিযাছিলেন। তিন দিন পূর্বে ওলাউঠা রোগে পিসিমা গত হইয়াছেন। গত রাত্রিতে পিসেমশায় তাঁহার অনুগমন করিযাছেন। পিসেমশায়ের মণিব্যাগ, পিসিমার গায়ের গহনা এবং শ্রীমতী কল্পনা, এই তিনটি বস্তুর ভবিষ্যৎ লইয়াই এই গোলযোগের সৃষ্টি। অনুনয়, সান্ত্বনা, ভীতি, লোভ প্রভৃতির নানাবিধ শরে বিদ্ধ হইয়া মেয়েটি ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করিয়া কাঁদিতেছে।

শিশির কল্পনাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি এখন কি করতে চাও?

আমাকে যদি আপনি সঙ্গে করে কলকাতায় পৌঁছে দেন।

কলকাতায় যাবে?

হ্যাঁ।

একজন পার্শ্ববর্তী পাণ্ডাগোছের লোক বলিল, কি হবে বাছা কলকাতায় গিয়ে? বৃন্দাবনে এসেছ, এ তো ভাগ্যের কথা। এখানেই থাক বাছা, রাধা-ভাবে সাধন করবে, জীবন সার্থক হবে।

শিশির একটু ধমক দিয়া বলিল, থামো তুমি। তারপর কল্পনাকে ডাকিয়া বলিল, তুমি এসো আমার সঙ্গে।

পাণ্ডাগোছের লোকটি বলিল, অমনি গেলেই হ'ল?

তার মানে?

বলি, এ পনর দিনের খরচপত্র কে দেবে শুনি?

কিসের খরচপত্র?

এই যে ঔষধপত্র, ডাক্তার, শ্মশানের খরচ, আমাদের পূজো-টুজোর খরচ—সে সব না হয় ছেড়েই দিলাম।

কত খরচ হয়েছে?

তা সত্তর-আশি টাকা তো হবেই—বরং হিসাব করলে আরো বেশি হবে।

এই কথা শুনিয়া কল্পনা তাহার হাত হইতে একগাছি বালা খুলিয়া এই লোকটিকে দিতে উদ্যত হইবামাত্র শিশির বলিল, থাক, ওসব পরে হবে'খন। আপাততঃ আমি দিচ্ছি দেনা শোধ করে।

পাণ্ডাগোছের লোকটি সঙ্গীদের লইয়া বিদায় লইল। কল্পনা পুঁটুলি সমেত শিশিরের অনুসরণ করিল।

পিসেমশায়ের ঘরে ঢুকিয়া কল্পনা আর একবার ভাল করিয়া কাঁদিয়া লইল। শিশিরের চোখের কোণেও জল জমিয়া উঠিল।

কলিকাতায় ফেরাই স্থির হইল। কল্পনা বলিল, আপনি আজই এলেন এত পরিশ্রান্ত হয়ে। দুই-একদিন বিশ্রাম করুন, তার পর কলকাতা ফেরার ব্যবস্থা করা যাবে।

নাঃ, আর দেরী করে কাজ নেই। এখানে যা রাধা-ভাবের ছড়াছড়ি। এখানে থাকতে আর সাহস হয় না।

কি যে বলেন! আপনি ভারী ভীতু।

ভারী সাহস হয়েছে, দেখতে পাচ্ছি। এই একটু আগেই তো ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কান্না হচ্ছিল।

আচ্ছা বেশ। চলুন আজই। আমারও আর একদণ্ড এখানে থাকতে ইচ্ছে নেই। মা-বাবার কথা মনে নেই। এই পিসিমা-পিসেমশাই আমার মা-বাবা ছিলেন। তাঁরাও আমায় ছেড়ে চলে গেলেন। কি সাংঘাতিক অপয়া মেয়ে আমি।

যাও, ওসব কথা বলতে নেই। সংসারে কত অঘটন কত সময়ে ঘটে। সবই সইতে হয়।

বৈকালের দিকেই তাহারা আগ্রা-টুণ্ডলা হইয়া কলিকাতার পথে যাত্রা করিল।

৫

আগ্রার পথে। ট্রেনে ভয়ানক ভিড়। উহারাই একমাত্র বাঙালী যাত্রী তাহাদের গাড়ীতে। কোনমতে এক কোণে কোণঠাসা হইয়া সময় কাটিতেছে। তবে উহাদের দুজনের কেহই একা নয় বলিয়া সময়টা তেমন দুর্বহ মনে হইতেছে না। জিনিসপত্রের স্তূপের জন্য এবং বাংলা ভাষার জন্য তাহাদের অবস্থানটা এত ভিড়ের মধ্যেও একটু নিরিবিলি ছিল।

কল্পনা বলিল, আমার জন্য আপনার বৃন্দাবন ভ্রমণ বৃথা হ'ল।

বৃন্দাবন-স্পর্শ তো হ'ল, যমুনায় স্নানও হয়েছে। কাজেই পুণ্যের মাত্রা কিছু কম হবে না।

তবু, হঠাৎ এমন করে চলে আসা।

কি আর করা যাবে? সব সময়ে সব কাজই কি নিজের ইচ্ছেমত হয়?

একে এই ভিড়, তার মধ্যে আবার আমি থাকাতে আপনার খুবই অসুবিধে হচ্ছে।

তা তো হচ্ছেই।

এইরূপ কথাবার্তা হয় মাঝে মাঝে। আবার ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিঃশব্দেও কাটে। জানালার বাহিরের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া, স্টেশনে গাড়ী থামিলে প্ল্যাটফর্মের ভিড দেখিয়া, আর সর্বসময়েই গাড়ীর ভিতরের গোলমাল, বাকবিতণ্ডা শুনিয়া সময় কাটিয়া যায়।

একবার কল্পনা বলিল, আগ্রা দিয়েই যখন যাব, একবার তাজমহলটা দেখে গেলে হয় না?

বেশ তো।

আগ্রায় পৌঁছিয়া একটি ধর্মশালায় জিনিসপত্র রাখিয়া উহারা গেল তাজমহল দেখিতে। বিমুগ্ধ বিস্ময়ে সমস্ত দিকটা চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। কল্পনা বলিল, ভারি চমৎকার, না?

হ্যাঁ।

কই, তুমি কিছু বলছ না?

বলব আর কি? সবই দেখছি।

আচ্ছা, এই সব চমৎকার দৃশ্য তোমার একা একা দেখতে ভাল লাগে?

লাগে।

আমি সঙ্গে আছি বলে বুঝি কিছু ভাল লাগছে না?

দেখছি তাজমহল! তুমি সঙ্গে আছ কি নেই সে কথা আসছে কিসে?

তা বটে।

তাজমহল দেখা শেষ করিয়া আগ্রায় ফিরিয়া দুই-একটা খেলনা, যেমন ছোট তাজমহল এবং জয়পুরী রেকাবী প্রভৃতি কিনিয়া তাহারা কলিকাতার পথে যাত্রা করিল।

কলিকাতার পথে।

হু হু করিয়া ট্রেন চলিযাছে। মাঝে মাঝে বড় স্টেশন পাইলেই শিশির প্লাটফর্ম হইতে এটা-ওটা খাবার জিনিস কিনিতেছে এবং দুজনে মিলিয়া গল্প করিতে করিতে খাইতেছে। কল্পনা মাঝে মাঝে বারণ করে। প্রতি স্টেশনেই কি খাবার কিনতে হয়?

সত্যি, রেলগাড়ীতে উঠলে কি ভীষণ খিদে পায়। আধঘণ্টা অন্তর খেতে ইচ্ছে করে।

স্টেশনের ছাইভস্ম অত খেলে পেটের অসুখ করবে যে।

তবু তাহারা খাবার কেনে, খায়, গল্প করে। সময় তো কাটানো চাই!

একবার হঠাৎ গম্ভীর হইযা কল্পনা বলিল, যতই কলকাতার কাছে যাচ্ছি ততই আমার ভয় হচ্ছে।

কিসের ভয়?

সেখানে গিয়ে কোথায় কার কাছে যাব?

দেখি, একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।

আচ্ছা, ধর যদি তোমাদের বাড়ীতে গিয়েই থাকি।

খবরদার, ওসব কথা কল্পনাও ক'রো না। তোমার আর আত্মীযস্বজন কেউ আছে কলকাতায়?

এক দূরসম্পর্কের মাসি আছেন শ্যামপুকুরে। সেইখানে গিয়ে বরং উঠবো।

তাঁরা থাকতে দেবেন?

তা হয়তো দেবেন। আজকাল লোকজনের যা কষ্ট। একটা বিনে মাইনের পেলে কে না রাখে?

অগত্যা তাই হবে।

বেশ, তাই হবে।

অনেকক্ষণ উভয়েই গম্ভীর হইয়া রহিল।

এমনি করিয়া কখনো কথা বলিয়া, কখনো গম্ভীর হইযা তাহারা চলিতে লাগিল কলিকাতার পথে।

প্রভাত হইয়াছে। আজই দুপুরবেলায় তাহারা কলিকাতায় পৌঁছিবে। গাড়ী যতই বাংলাদেশের দিকে অগ্রসর হইতেছে, ততই মাঠ ও বনের ধূসরতা কমিতেছে, শ্যামলতা বাড়িতেছে। মাঠ ও বনের স্নিগ্ধ মনোরম রূপ মনটাকেও আর্দ্র করিয়া তুলিতেছে। জানালার পাশে বসিয়া শিশির ও কল্পনা চাহিয়া চাহিয়া বাংলার অপরূপ রূপ দেখিতেছে।

কল্পনা বলিল, দেখেছো কি সুন্দর এই বাংলাদেশ। এই ছেড়ে তুমি গিয়েছিলে বৃন্দাবনে?

ছেড়ে যাব কেন? গিয়েছিলুম যে কেন তা তোমার আর শুনে কাজ নেই।

তীর্থ করতে গিয়েছিলে, পুণ্য করতে কিংবা দেশ দেখতে, কি বল?

হ্যাঁ, তাই এক রকম বটে।

খানিকক্ষণ পরে কল্পনা বলিল, আচ্ছা একটা কথা বলবো?

কথা বলবার জন্য আমার অনুমতির কি বিশেষ দরকার আছে?

না, তাই বলছি। আচ্ছা, আমাকে দেখে তোমার একটুও কিছু মনে হচ্ছে না?

নিশ্চয়ই হচ্ছে। নইলে বৃন্দাবন থেকে ঘাড়ে করে কলকাতায় নিয়ে চলেছি কেন?

তা, ঘাড়ে করে যদি এত দূরই আনলে, তবে আর একটু কষ্ট করে আমায় তোমাদের বাড়ী নিয়ে চল না কেন। তোমার মা-বাবাকে একবার প্রণাম করে আসি।

সর্বনাশ! তুমি যাবে আমাদের বাড়ী? আমার সঙ্গে? বাড়ীর সবাই তো ঠিক তাই চায়।

বাড়ীর সবাই চায়, আমিও চাই, অথচ তুমি মাঝখান থেকে বাগড়া দিচ্ছ কেন?

দেখ, তা হলে খুলেই বলি, এইসব কারণেই আমি ছুটি নিয়ে পুরী বৃন্দাবন ছুটোছুটি করছি।

তা হলে তো ঠিক সময়েই আমাদের দেখা হয়েছে।

মানে?

মানে কিছু না, এমনিই বললাম। এখন বুঝছি, তুমি বিবাগী হয়ে বৃন্দাবন-বাস করবে বলে গিয়েছিলে। আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে এলুম।

মোটেই না। আমার ছুটি ফুরোতেও বেশী দেরী নেই।

ট্রেন যথাসময়ে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছিল। একখানি ট্যাক্সি করিয়া উহারা শ্যামপুকুরের একটি গলিতে ঢুকিল। ছোট একখানি দোতলা বাড়ীর দরজায় জিনিসপত্র নামাইয়া দিয়া ট্যাক্সি ফিরিয়া গেল।

কল্পনার মেসোমশায় বাড়ী ছিলেন না। মাসিমা উহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন।

প্রথমে বিস্মিত হইলেন, পরে দুঃখিত হইয়া চোখ মুছিলেন। তারপরে বিরক্ত হইলেন এবং অবশেষে স্বাভাবিক ভাব প্রাপ্ত হইয়া কল্পনার পুঁটুলিটা লইয়া যত্ন করিয়া সিন্দুকে তুলিয়া রাখিলেন।

অনেক বেলা হইয়াছিল। কল্পনার ও তাহার মাসিমার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া এখানেই মধ্যাহ্নভোজন সারিয়া একটু বিশ্রাম করিয়া শিশির বিদায় লইল। কল্পনা দরজার কাছে আসিয়া বিষণ্ণমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। শিশির দৃষ্টিপথের বাহির হইয়া গেলে আস্তে আস্তে দরজা বন্ধ করিয়া ভিতরে আসিয়া মাসিমার ছোট ছেলেটিকে কোলে তুলিয়া লইল।

শিশির বাড়ী ফিরিল। বাড়ীর সকলেই মহা ব্যস্ত হইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। কোথায় ছিল, কেমন ছিল, কেন এত দেরি হইল ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে শিশির ক্লান্ত হইয়া পড়িল।

পিসিমা বলিলেন, ভালয় ভালয় যে ফিরে এসেছে, সেই ভাগ্যি। আর তোমরা ওকে উত্যক্ত কোরো না।

ছেলে পাছে আবার বিবাগী হইয়া গৃহত্যাগ করে, এই আশঙ্কায় আর কেহ তাহার বিবাহাদি সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করে না।

৬

তিন বৎসর পরে। ওয়াই এম সি এ রেস্তোরাঁ। একটি কেবিনের মধ্যে দুইটি প্রাণী চা ইত্যাদি খাইতেছেন। সবুজ পর্দার ফাঁক দিয়া মাঝে মাঝে দুইখানি হাত দেখা যাইতেছে। একখানি সুন্দর নিটোল—কব্জির নিচে পাঞ্জাবির হাতা। আর একখানি হাত নিকষ কালো ও সরু, কব্জির নিচে দুইগাছি সরু চুড়ি। মৃদু কথা ও হাসি মাঝে মাঝে শুনা যাইতেছে।

একবার একটি হাত একটি খাইবার জিনিস অপরের মুখে তুলিয়া দিতে গেলে, অপর দিক হইতে একটু বাধা আসিল এবং এই মৃদু কলহের ফলে টেবিলের উপরের একটি পেয়ালা মাটিতে পড়িয়া ঝন্ ঝন্ করিয়া ভাঙিয়া গেল। ইঁহারা অপ্রতিভ হইলেন। রেস্তোরাঁর বয় তাড়াতাড়ি ভাঙা পেয়ালাটি তুলিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল।

ইঁহারা আর কালবিলম্ব না করিয়া বিল চুকাইয়া দিলেন এবং পেয়ালার বাবদ কিছু ক্ষতিপূরণ দিয়া বাহির হইয়া আসিলেন।

ট্রামের জন্য ইঁহারা অপেক্ষা করিতেছেন। অপর ফুটপাথে যেন হঠাৎ আলো জ্বলিয়া উঠিল। সকলেই একবার সেদিকে চাহিয়া দেখিল। ইঁহারাও দেখিলেন।

যাহা দেখিলেন তাহা এমন কিছু নয়। কল্পনা আর তার স্বামী দাঁড়াইয়া আছে, অপর দিকের ট্রামের জন্য।

কল্পনা ও তার স্বামী অমল দুজনেই রাস্তার অপর দিকে দণ্ডায়মান মনুষ্য দুইটিকে লক্ষ্য করিয়াছে।

অমল বলিল, ওই মেয়েটিকে দেখেছ। ওকে প্রায়ই দেখি ট্রামে-বাসে।

দেখেছি বই কি। আমাদের পাড়ায়ই তো থাকে।

উঃ, কি ভীষণ কালো!

তাতে আর হয়েছে কি? গায়ের রঙে কি আসে যায়?

নাক তো একেবারেই নেই।

নাই বা থাকলো, নিঃশ্বাস ফেলতে পারলেই হলো।

চাকরি-টাকরি করে বোধ হয়।

হ্যাঁ। আগে তো শুধু হৈ হৈ করে বেড়াতো, লোকে কত কি বলতো। এখন নাকি টেলিফোন অফিসে কাজ করে।

তুমি এত খবর জানলে কি করে?

বা রে, ওর মাসি রাধু নাপতিনী আমাদের বাড়ীতে এখনো আলতা পরাতে আসে।

সঙ্গে ও ভদ্রলোকটি কে? বেশ ভদ্রলোক বলেই তো মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ, ওঁর নাম শিশিরবাবু। মেয়েটি ওঁর চেয়ে প্রায় দশ বছরের বড়।

ওঁকেও চেন তুমি?

বা রে, ওঁর সঙ্গেই তো বৃন্দাবন থেকে ফিরলুম। তোমাকে বলেছিলুম না?

ইনিই তিনি?

হ্যাঁ।

সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭

তাড়াতাড়ি

১

বর্তমান যুগ তাড়াতাড়ির যুগ। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত, বৎসরের প্রথম দিন হইতে শেষ দিন পর্যন্ত, শুধু তাড়াতাড়ির হুড়াহুড়ি! তাড়াতাড়ি গাত্রোত্থান করিতে হইবে, তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুইতে হইবে, তাড়াতাড়ি চা খাইতে হইবে, তাড়াতাড়ি বাজারে যাইতে হইবে, তাড়াতাড়ি ক্ষৌরকর্ম করিতে হইবে, তাড়াতাড়ি স্নান করিতে হইবে, তাড়াতাড়ি খাইতে হইবে, তাড়াতাড়ি বেশভূষা করিতে হইবে, তাড়াতাড়ি ট্রাম বাস ধরিতে হইবে, তাড়াতাড়ি কর্মস্থলে যাইতে হইবে, তাড়াতাড়ি কর্মস্থল হইতে ফিরিতে হইবে, তাড়াতাড়ি একটু বিশ্রাম করিতে হইবে, তাড়াতাড়ি টুইশনি করিতে যাইতে হইবে, তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিতে হইবে, তাড়াতাড়ি ডাক্তারের বাড়ী যাইতে হইবে, আবার তাড়াতাড়ি আহারাদি সারিয়া তাড়াতাড়ি শয়ন করিতে হইবে।

শুধু দৈনন্দিন কর্মে নয়, সর্বপ্রকার সর্ব কর্তব্যই তাড়াতাড়ি সারিতে হইবে। হাঁটিয়া যাইতে দেরি হয়, রিক্‌শায় যাইতে হইবে। রিক্‌শায় দেরি হয়, ট্যাক্সিতে যাইতে হইবে। ট্রেনের গতি যথেষ্ট তাড়াতাড়ি নয়, সুতরাং এরোপ্লেনে যাইতে হইবে। সর্বক্ষেত্রে সর্বত্র সর্ব কর্মে একটা অতিব্যস্ততা অতি চাঞ্চল্য অতি-উৎসাহ যেন পাইয়া বসিয়াছে। তাড়াতাড়ি উন্নতিলাভ করিতে হইলে নাকি সবই তাড়াতাড়ি করিতে হয়।

শরীর ও মনের প্রসার ও পরিতৃপ্তির জন্য মানুষ শুধু কর্মই চায় না, চায় শান্তি, চায় আনন্দ, চায় বিশ্রাম, চায় অবসর। কিন্তু এই সকল বস্তুও আমাদিগকে অতি তাড়াতাড়ি সমাধা করিতে হয়। শিশুকে আদর করিবার সময়ে তাড়াতাড়ি, বন্ধুত্ব করিতে তাড়াতাড়ি, সিনেমা দেখিতে তাড়াতাড়ি, পূজার্চনায় তাড়াতাড়ি, তীর্থ-ভ্রমণে তাড়াতাড়ি, সমগ্র জীবনটাই যেন একটা অবিচ্ছিন্ন তাড়াতাড়ি।

এই তাড়াতাড়ির আবর্তে আমরা সকলেই হাবুডুবু খাইতেছি। শ্রীমান অভিনব সেনও এই আবর্তে নিমজ্জিত। প্রাতঃকাল হইতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত তাহার তিলমাত্র অবসর নাই। অথচ অভিনব মানুষ। সাধারণ সকল মানুষের মত তাহার মন আছে, বুদ্ধি আছে, কল্পনা আছে, অনুভূতি আছে। তাড়াতাড়ির বাহুল্যের মধ্যেও তাহার মনের কবিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই। সে স্থির করিয়াছে, কবিতা লিখিবে। তাড়াতাড়ির মধ্যেই সে কবিতা লিখিবে, নতুবা তাহার মন শান্তি পাইবে না।

শ্রীমতী কুসুমিকা সোম ভীষণ ব্যস্ত। কত কাজ তার! মরবার সময় তার নাই। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, কাহারও সহিত দুদণ্ড গল্প করিতে পারে না, ক্লান্ত শরীরে দুই-চার ঘণ্টা যে শুইয়া বসিয়া কাটাইয়া দিবে, এমন সময় তাহার নাই। একটার পর একটা শুধু কাজ আর কাজ। কখনও হাঁটিয়া, কখনও রিক্‌শায়, কখনো ট্রামে, কখনও বাসে, কখনও ট্যাক্সিতে কুসুমিকা ছুটাছুটি করে। কি ভীষণ তাড়াতাড়ি! একটুও অবসর নাই তার জীবনে। অথচ তাহার মনের গহনে জাগ্রত রহিয়াছে চিত্রাঙ্কনস্পৃহা। সে চিত্র আঁকিবে, চিত্রশিল্পী হইবে, আপন মনের আনন্দ সে বিতরণ করিবে সকলের মাঝে, চিত্রের মাধ্যমে। কিন্তু সময় একেবারেই নাই। তবু এই সময়াভাবের মধ্যেই ফুটিয়া উঠিবে তাহার প্রতিভা, বিকশিত হইয়া উঠিবে তাহার কবি-কল্পনার বিচিত্র কুসুমকলিকা।

কুসুমিকা চেনে অভিনবকে, অভিনব চেনে কুসুমিকাকে। একদিন সাক্ষাৎ একটি রাস্তার মোড়ে। কুসুমিকা বলিল, একটা কথা ছিল আপনার সঙ্গে। কিন্তু অভিনবের সময় কোথায় কথা শুনিবার? আর একদিন হবে', এই কথা বলিযাই অভিনব তাডাতাড়ি লাফ দিয়া উঠিযা পড়িল একটি ট্রামে। আর একদিন আর এক রাস্তার মোড়ে কুসুমিকাকে দেখিতে পাইয়া অভিনব বলিল, আপনার সঙ্গে একটু দরকারী কথা ছিল। কুসুমিকা বলিয়া উঠিল, ওরে ব্বাপ্, আজ আমার মরবারও সময় নেই। এই কথা বলিয়াই সে একটি রিক্‌শায় উঠিয়া বসিল। এমনি করিয়া বহুবার উহাদের সাক্ষাৎ হইযাছে, কিন্তু শুধু তাডাতাড়ির জন্যই তাহারা একটু মনের কথা পরস্পরকে বলিতে পারে নাই।

একদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে অভিনব ও কুসুমিকা দুজনেই গিয়াছে লেকে, একটু বিশ্রাম করিতে। কেহই জানিত না যে তাহাদের এমনি করিযা সাক্ষাৎ হইবে। অভিনব বলিল, আজ একটু বেরিয়ে পডলাম। একটু বিশ্রাম না করলে আর চলছে না। কুসুমিকা বলিল, আমারও সেই কথা। শরীরে মনে আর বইছে না। চলুন এখানেই একটু বসা যাক।

২

কিছুক্ষণ কোন কথাই হইল না। তারপর অভিনব বলিল, আপনি জানেন, আমার একটু কবিতার শখ আছে।

হ্যাঁ। শুনেছিলাম আপনার কাছেই। বই-টই বেরিয়েছে?

না, এখনও মনে মনেই রয়েছে। লেখা হয়ে ওঠেনি।

কেন ?

সেই কথাই আপনাকে কতদিন থেকে বলব বলব মনে করছি।

কি কথা, বলুন না। একটু তাড়াতাড়ি বলবেন। আমায আবার তাডাতাডি বাড়ী ফিরতে হবে।

মানে, প্রথম অসুবিধে হচ্ছে, মনে যে কল্পনা আসে, তা প্রকাশ করবার মত কথা খুঁজে পাচ্ছি নে। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, লাইনের শেষে বা চরণের শেষে একটা কথা লিখে, পরে আর তার মিল খুঁজে বের করতে পারছি নে।

কথাও খুঁজে পাচ্ছেন না, মিলও খুঁজে পাচ্ছেন না ?

না। সেই তো হয়েছে মুশকিল। একটা লাইনে লিখেছিলাম—বহিছে প্রবল ঝঞ্ঝা। ঝঞ্ঝার সঙ্গে মিল হতে পারে এমন কোন কথা খুঁজে পাচ্ছি নে।

তা, আপনি লাইনের শেষে অমন একটা কথা লিখতে গেলেন কেন ? যদি লিখতেন, প্রবল ঝঞ্ঝা বহিছে, তাহলে বহিছের সঙ্গে কহিছে, কাঁদিছে, হাসিছে, এই রকম অজস্র কথা পেতেন।

তা বটে। কিন্তু আসলে, কথাই যে ঠিকমত মনে পড়ে না।

আপনি এক কাজ করুন। নূতন মতের কবিতা চর্চা আরম্ভ করুন।

মানে ?

মানে তাতে শব্দনির্বাচন দরকার হয না, মিলের হাঙ্গামাও নেই, আর অর্থ না থাকলেও ক্ষতি নেই। বরঞ্চ কোন অর্থ না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

সেটা কি সুবিধে হবে ?

হ্যাঁ, সেইটেই সুবিধে। এই তাডাতাডির যুগে, নানারকম শব্দ-সঙ্কলন আর বসে বসে মিল খোঁজার সময কই ? আমি চিত্রকলাতেও এই নূতন পথ ধরেছি। বসে বসে ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকার যুগ চলে গেছে। উঃ কি অপব্যয় সময়ের ! সেকালের চিত্রকলা চলে গেছে ক্যালেণ্ডারে, খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে, বইয়ের মলাটে, বিস্কুটের টিনের গাযে আর সিনেমার পোস্টারে। একালের কলা অত্যন্ত সহজ হয়ে গেছে। এই তাডাতাড়ির যুগে ঠিক উপযুক্ত এই তাড়াতাড়ি-কলা।

আপনি আমাকে একটু ভাবিযে তুললেন। আচ্ছা, আপনার কথা অনুসারে, শব্দার্থ, মিল এবং বোধগম্যতা, এই তিনটিকে বাদ দিয়েই কবিতা লেখার চেষ্টা করব।

শুধু চেষ্টা করব নয়। বলুন, লিখবো। দেখবেন, কেমন তাড়াতাড়ি অতি সহজে কবিতা লেখা যায়। অন্য সব রকম কাজকর্মের মধ্যে বসেও এ-সব কবিতা লিখতে কোন কষ্ট হবে না।

বেশ, দেখব চেষ্টা করে।

আবার বলছেন, চেষ্টা করব? বলুন, লিখবো। আচ্ছা, আসছে রবিবারে ঠিক এইখানে আমরা আবার আসব আর আপনার নূতন কবিতা শুনব। এমনি করে তাগিদ না দিলে আপনার কবি-প্রতিভার বিকাশ হবে না।

সেইজন্যই তো আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য আমি সর্বক্ষণ ব্যাকুল হয়ে থাকি।

ব্যাকুল-আকুল হবার কোন দরকার নেই। কবিতা নিয়ে আসা চাই, মনে থাকে যেন।

আচ্ছা, আসব। আর আপনিও আপনার একখানা নূতন চিত্র নিয়ে আসবেন। চিত্রের নূতন পথটাও আমি একটু দেখব।

আচ্ছা, আনব। নূতন চিত্রকলা নূতন কবিতার চেয়েও অনেক সহজ। দেখলেই বুঝতে পারবেন। আজ আমি উঠি। রিস্টওয়াচের দিকে তাকাইয়া কুসুমিকা যেন চমকাইয়া উঠিল। উঃ, কত দেরি হয়ে গেল। এইজন্যই তো আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই নে।

তা, একদিন একটু দেরি হ'লই বা!

না, না। আমার ভীষণ তাড়াতাড়ি।

কুসুমিকা উঠিয়া পড়িল। লেকের চারিধারে লোকসমাগম বেশ ঘন হইয়া উঠিয়াছে। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। লেকের নিস্তরঙ্গ জলে তাহার ছায়া নাচিতেছে, কাঁপিতেছে। আঁধার আলোর অপূর্ব মিশ্রণে লেকের জল, লেকের তরুলতাময় দ্বীপ, লেকের সেতু, লেকের কয়েকটি লম্বা নৌকা, লেকের চারিদিকের বড় বড় বৃক্ষরাজি, সকলে মিলিয়া যেন একটি স্বপ্নরাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছে। এই স্বপ্নমায়া কাটাইয়া অত্যন্ত অনিচ্ছায় কুসুমিকা এবং অভিনব তাহাদের তাড়াতাড়িময় জীবনপথে পদক্ষেপ করিল।

৩

পরের রবিবার। নির্দিষ্ট সময়ে কুসুমিকা এবং অভিনব নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়াছে। লেক ভ্রমণকারীদের ভিড় ক্রমশঃ বাড়িতেছে। দুই-একখানা মোটর-গাড়ী রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছে, অথবা লেকের রাস্তার পাশে যাত্রী নামাইয়া দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কেহ একাকী, কেহ বন্ধু-বান্ধবসহ, কেহ সস্ত্রীক, কেহ শিশু-সন্তানের হাত ধরিয়া চলিয়াছেন বিভিন্ন দিকে। মুড়ি, চীনাবাদাম, অবাক জলপান, বিবিধ প্রকার ভাজা, আইসক্রীম, কমলালেবু প্রভৃতি বিক্রয়ের জন্য ফেরিওয়ালারা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

এদিক ওদিক একটু চাহিয়া এই জনসমাকীর্ণ অপরাহ্ণে একটি গাছের পার্শ্বে কুসুমিকা ও অভিনব আসিয়া বসিল। বসিয়াই অভিনব বলিল, এই নিন।

এই কথা বলিয়া ডালমুট চীনাবাদাম প্রভৃতি ভাজার একটি প্যাকেট কুসুমিকার হাতে দিল। কুসুমিকা প্যাকেটটি খুলিয়া অভিনবের দিকে আগাইয়া দিয়া বলিল, এই নিন, খান।

ডালমুট মুখে পুরিয়া দিয়া অভিনব বলিল, আপনার ছবি এনেছেন ?

এনেছি। আপনি কবিতা এনেছেন ?

এনেছি। আগে আপনার ছবি দেখান।

উঁহু। আগে আপনার কবিতা।

বেশ, তাই হোক।

অভিনব পকেট হইতে একখানি ছোট খাতা বাহির করিল এবং তাহা হইতে একটি পাতা বাহির করিল—অবশ্য খুব ধীরে ধীরে, যাহাতে পাশের লোকেরা ভাল করিয়া দেখিতে না পায়।

অভিনব বলিল, আমার এই প্রথম প্রচেষ্টায় আপনিই প্রথম শ্রোতা। জানিনে, আপনার কেমন লাগবে।

বেশ লাগবে। আপনি পড়ুন।

অভিনব একটু ইতস্তত করিয়া খুব ধীরে ধীরে পড়িতে লাগিল—

উপরে সোনালি রোদ,
নীচেয় ভাপ্‌সা ডাস্টবিন, নীল চোখ,
লাল সাড়ী, অদ্ভুত খেয়াল—
শুঁয়াপোকার শুঁয়াহিল্লোল,
নিঃশ্রেয়স হৈয়ঙ্গবীন কর্তাভজা পুমান
উদ্যৎকৃপাণ ছেঁড়া-লণ্ঠন ভাঙা-কলসী
গুবুরে পোকা খতোড্‌ধিপতি
অন্ধকার করবীকুসুম নিত্যোৎসব মাখা
মহীক্ষিৎ নৈয়গ্রোম ছিঁচকাঁদুনে
বিশ্রী পরিস্থিতি গভীর অরণ্য
নৈস্ত্রিংশিক প্রত্যালীঢ় ব্যংসিকা
বর্চস্বী আহা মরি, সমজ্যা বৃহতী.
শুধু কান্না আর কান্না !

কুসুমিকা বলিয়া উঠিল, বাঃ, কি চমৎকার ? আচ্ছা, এর মধ্যে কোনখানে নেই ?

অভিনব বলিল, রামঃ, মানে থাকলে কি নূতন কবিতা হয় ? তবে কথাগুলো সব অভিধানে আছে।

এগ্‌জ্যাকৃটলি। ছন্দ, মিল এবং মানে থাকাটা কবিতার পক্ষে একেবারে মারাত্মক !

তবে কবিতার একটা নাম থাকা দরকার। কি বলেন ?

আপনিই বলুন না কি নাম দেওয়া যায়।

আমার মতে এ কবিতার নাম হওয়া উচিত "উর্বশী"।

কেন ?

এর কোন কারণ নেই। তবে, ওই যে লিখেছেন, নীল চোখ, লাল সাড়ী—ওটা ভারি সাজেস্টীভ।

আচ্ছা, এ কবিতাটির নাম "শুঁযাপোকা" রাখলে কেমন হয ?

মন্দ কি ? ভালই হয।

কিংবা "কচুপোড়া" ?

তাও বেশ মানায়। মোট কথা, নামে কি আসে যায় ! কবিতা কবিতাই।

তা যে নামেই তাকে ডাকা হোক না কেন। কি বলেন ?

আমারও তাই মত। তা হ'লে আমার রচনা আপনার ভাল লেগেছে ?

নিশ্চযই। কি চমৎকার কবিতা !

আমার লেখা সার্থক হ'ল। উঃ, কি তাড়াতাড়িতেই না এটা লিখেছি।

বেশ করেছেন। ভেবে-চিন্তে কি আর কবিতা লেখা হয ?

যাক। এবার আপনার নূতন ধরনের ছবিটি দেখান।

কুসুমিকা বিনীতভাবে বলিল, আমার ছবি কি আপনার ভাল লাগবে ?

নিশ্চয়ই লাগবে।

কুসুমিকা তাহার ভ্যানিটি-ব্যাগ হইতে গোল করিয়া মোড়া একখানি আর্ট-পেপার বাহির করিল। ধীরে ধীরে সেটি মেলিয়া ধরিয়া বলিল, এই দেখুন।

অভিনব দেখিল, কাগজখানিতে কতকগুলি সরলরেখা নানাভাবে টানা হইয়াছে। আর তাহার মধ্যে মধ্যে অনেকগুলি বিবিধ সাইজের বৃত্তাংশ বা সার্কুলার আর্ক টানা হইয়াছে। এই সকল রেখাগুলির ফাঁকগুলিতে লাল, নীল, হলদে এবং সবুজ রং মাখাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

অভিনব বলিল, এ ছবিখানা আঁকতে আপনার কতক্ষণ সময় লেগেছে ?

আমার কি সময় আছে? তবু কাজের ফাঁকে মিনিট পাঁচেক বাঁচিয়ে রুলার আর কম্পাস দিয়ে এ ছবিখানা এঁকে ফেলেছি। কেমন লাগছে?

খাসা, চমৎকার!

অবশ্য ছবির মানে থাকা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু একটা নাম দেওয়া দরকার। আপনি একটা নাম সাজেস্ট করুন না।

আমি বলি, এটার নাম রাখুন 'রামধনু'।

কুসুমিকা বলিল, রামধনুতে সাতটি রং থাকে। এতে মাত্র চারটি রং।

তাতে আর কি? সত্যিই তো রামধনুর ছবি এটা নয়। একটা সিমবল মাত্র। যাহোক হলেই হল।

আচ্ছা, এটার নাম "পিসিমা" রাখলে কেমন হয়?

ভালই হয়। আপনার যদি পছন্দ হয়, তবে ওই নামই রাখুন।

কুসুমিকা পুনরায় বলিল, আচ্ছা, আমার আর একটা নাম মনে হচ্ছে। কিন্তু আপনার মনোমত হবে কি না জানিনে।

অভিনব বলিল, আপনার পছন্দ হলে আমারও পছন্দ হবে। আপনি কি নাম দিতে চান?

আর মনে হয়, এটার নাম 'বাঁধাকপি' দিলে বেশ হয়।

মন্দ কি? বেশ নাম। কি করে এ নামটা আপনার মনে এল?

ওই যে গোল, আধগোল, সবুজ রং-এর পোঁচ, ওগুলি গোল গোল বাঁধাকপির সবুজ পাতার কথা মনে করিয়ে দেয় না কি?

তা দেয়। তাহলে এ ছবিটার নাম 'বাঁধাকপি'ই থাক।

তাই থাক।

কুসুমিকা বলিল, অনেক আলোচনা হয়েছে। এইবার উঠি।

এখুনি উঠবেন? একটু বসুন না। কিংবা চলুন একটা রেস্তোঁরায়। একটু নিরিবিলি—

উঁহু, আমার যে ভীষণ তাড়াতাড়ি।

এই কথা বলিয়া কুসুমিকা উঠিয়া হনহন করিয়া চলিতে লাগিল। অভিনব কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া চোখ ফিরাইয়া লেকের জলরাশির পরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল।

জুন, ১৯৫৮

ফাংশন

ত্রিলোচন তালুকদার তালতলায় একটি তিনতলা বাড়ীর তেতলার ফ্ল্যাটে বাস করেন। একটি বড় সদাগরি অফিসে মাঝারি গোছের একটি চাকুরি করেন। বাড়ীতে অনেকগুলি লোক। বয়সে বড় একটি বিধবা ভগিনী সরলা এই সংসারেই থাকেন। আর আছেন স্ত্রী, তিনটি পুত্র ও একটি কন্যা এবং জ্যেষ্ঠ-পুত্রের বধূ। জ্যেষ্ঠপুত্র রমেশ একটি চাকুরি পাইযাছে। দ্বিতীয় পুত্র গণেশ বি-এ পড়ে। কনিষ্ঠ পুত্র মহেশ স্কুলে পড়িতেছে। কন্যা নির্মলা আই-এ সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্রী। আর একটি ক্ষুদ্র প্রাণীর কথা বলা হয় নাই। জ্যেষ্ঠপুত্রের শিশুপুত্র ঘেণ্টু, বযস আড়াই বৎসর। ত্রিলোচনবাবুর দূরসম্পর্কীয একটি ভাগিনেয়ও সম্প্রতি এই সংসারে আছে। কলিকাতার নানাস্থানে ঘুরিযা ঘুরিযা একটা কাজকর্মের সন্ধান করিতেছে।

ত্রিলোচনবাবুর নযটা-ছযটা অফিস। রবিবার বা কোন ছুটির দিন ব্যতীত তাঁহাকে বাড়িতে প্রায দেখাই যায না। সন্ধ্যার পরই ক্লান্ত দেহ বিছানায এলাইয়া দেন। সংসার দেখেন তাঁহার স্ত্রী। তাঁহারই মুখে নানা অভাব অভিযোগের কথা শুনিতে শুনিতে নিজের অজ্ঞাতসারেই ঘুমাইযা পড়েন।

একটি ছুটির দিন। ত্রিলোচনবাবু যেন একটু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচেন। সকালে একটু দেরি করিযাই শয্যাত্যাগ করেন। মুখহাত ধুইযা বারান্দায় বসিয়া চাকরের আনা চাযের বাটিতে চুমুক দিতে দিতে কনিষ্ঠপুত্র মহেশকে ডাকিয়া বলিলেন, আজ তো ছুটি, একবার বাজারে যাও না।

বাজারে? অসম্ভব।

কেন?

আমার ইস্কুলে আজ বিরাট ফাংশন। নতুন ছাত্রদের স্বাগত-অভিনন্দন।

সে তো বিকেলে।

বিকেলে হলে কি হয়। এখন থেকেই কাজে লেগে যেতে হবে। এই কথা বলিয়াই মহেশ একটি শার্ট গাযে দিযা হাফ্-প্যাণ্ট পরিয়া প্রায় ছুটিয়াই বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

---

* 'ফাংশন' এই গল্পটি ১৯৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে লিখিত এবং ৫ই জুন, ১৯৫৫, তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই গল্প অবলম্বনে রচিত একটি নাটিকা "ফাংশন"—এই নামেই ১৯৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশন উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অভিনীত হইয়াছিল।

ত্রিলোচনবাবু চায়ের বাটি নামাইয়া রাখিয়া গণেশকে ডাকিয়া বলিলেন, একবার বাজারটা করে এস না।

গণেশ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, কি সর্বনাশ!

অপ্রতিভ হইয়া ত্রিলোচনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি?

খবরের কাগজ পড়েন নি?

কাগজ পড়েছি বৈ কি, তবে সব খবর পড়বার সময় কোথায়?

আজকে গঙ্গায় বিরাট ফাংশন!

গঙ্গায় ফাংশন?

হ্যাঁ। কুড়ি মাইল সন্তরণ-প্রতিযোগিতা।

তুমি প্রতিযোগিতায় যোগ দেবে নাকি?

হ্যাঁ। আমাকে নৌকা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে যেতে হবে। আমি এখুনি চললাম।

গণেশ চলিয়া গেল।

রমেশ বেশ একটু বেলা করিয়াই উঠিয়াছে। তাহার পক্ষে এখনই বাড়ীর বাহির হওয়া সম্ভব নয় অনুমান করিয়া ত্রিলোচনবাবু তাঁহার ভাগিনেয় গোবিন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, রোজই তো চাকরের হাতে বাজার, একবার যাও না, বাবা। বাজারে কি আসে না আসে, কিসের কত দর, একটু জেনে এস, আর মাছ তরকারি দেখে শুনে কিনে নিয়ে এস।

গোবিন্দ বলিয়া উঠিল, মামাবাবু কি যে বলেন!

তোমার আবার কি হল?

আপনি শোনেন নি বুঝি?

কি শুনিনি?

আজ শ্রীরামপুরে গজল প্রতিযোগিতা হবে। বেলা সাড়ে দশটায় আরম্ভ।

তোমার আবার গান-টান আসে নাকি? তা তো জানতাম না।

কি করে জানবেন? সমস্ত দিনটা বন্ধ থাকেন আপনার অফিস-ঘরে।

তা গজল কি দুপুরে গায়?

গলা থাকলে সব সময়েই গাওয়া যায়। আমাকে এখনি বেরুতে হবে।

খাওয়া দাওয়া?

সে হবে'খন যা হয়। না হয়.এক বেলা উপোসই করব।

গায়ে একটি পাঞ্জাবি গলাইয়া, পায়ে একজোড়া স্যাণ্ডাল ঢুকাইয়া গোবিন্দ গজল গাহিতে চলিয়া গেল।

ত্রিলোচনবাবু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে বাজারের থলিটি হাতে করিয়া গৃহিণীকে বলিলেন, কি আনতে হবে ?

বাজার থেকে কি আনতে হয়, জান না ?

তা জানি। তবু—কোন্‌দিন কি দরকার, একটু বলে দিলে ভাল হয় না কি ?

এই কথা বলিয়া এবং গৃহিণীর ফর্দ শুনিয়া লইয়া ত্রিলোচনবাবু ধীরে ধীরে বাজারের দিকে চলিলেন।

আহারাদি শেষ করিতে বেশ একটু বেলা হইল। ছুটির দিন! সকলেরই একটু গড়িমসি ভাব। আহার শেষ হইলে, আঁচাইতে আঁচাইতে ভগিনীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, দিদি, এবার একদিন পিঠে করলে না ? আজ ছুটির দিন ছিল—

কি যে বল ? আমার কি মরবার সময় আছে ? আজ আমার তিন-তিনটে ফাংশন !

তিন-তিনটে ফাংশন ! তোমার ? কোথায় ?

ওই তো দর্জিপাড়ার বিধবাতারিণী সমিতির বার্ষিক মহোৎসব, তারপর বেলেঘাটার কুলবধূ প্রগতি সঙ্ঘের ষান্মাসিক প্রগতি প্রতিযোগিতা, তারপর শ্যামবাজারের প্রৌঢ়া সম্মেলনের রজত-জয়ন্তী। এইবার বোঝ। কখন তোমাদের জন্য পিঠে করি ? তে হি নো দিবসা গতাঃ। বুঝেছ, মানুষের জীবন পিঠের অনেক উপরে। মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশের একমাত্র পথ ফাংশন। অফিসের কলম চালিয়ে চালিয়ে তোমার অন্তরাত্মা বিমূঢ় হয়ে গেছে। যাক্, তুমি এসব কথা ঠিক বুঝতে পারবে না। আর আমারও এখন বক্তৃতা করবার সময় নেই। এখুনি আমাকে বেরুতে হবে। ফিরতে রাত এগারটা-বারটা হবে।

বক্তৃতা শুনিয়া ত্রিলোচনবাবু পরম পুলকিত হইলেন। কোন উত্তর দিবার সাহস, ইচ্ছা বা সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। আহারের পর একটু বিশ্রাম করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরেই লক্ষ্য করিলেন, তাঁহার কন্যা নির্মলা সাজিয়া গুজিয়া বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। তাহাকে ডাকিয়া ত্রিলোচনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ভরদুপুরে অসময়ে কোথায় বেরুচ্ছ ? একটু বিশ্রাম করলে হত না ?

নির্মলা বলিল, আমার আজ ভয়ানক কাজ !

কি এমন কাজ ? আজ তো কলেজের ছুটি।

আজ তিনটে ফাংশনে যেতে হবে আমাকে। একটা ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে, একটা নর্দার্ন হলে আর একটা মহাগুরু সোসাইটিতে।

এত ঘোরাঘুরি করলে শরীর খারাপ হবে না ?

উপায় নেই। ফাংশনে যেতেই হবে। কথা দিয়েছি যে!

কি আর বলব, বল। তোমার শরীর এমন কিছু বলিষ্ঠ নয়, তারপর খাওয়া দাওয়ার এই অবস্থা। এর পরে শরীরের উপর এত অত্যাচার করাটা কি ভাল?

সবই বুঝি। কিন্তু ফাংশন বাদ দেওয়া চলে না।

ত্রিলোচনবাবু নীরব। নির্মলা ধীরে ধীরে একটি পুঁটলি হাতে করিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। মনে হইল, সিঁড়ির প্রতি ধাপে ধাপে তাহার পুঁটলির মধ্যে ঘুঙুরের টুং-টাং শব্দ শোনা যাইতেছে।

ত্রিলোচনবাবু একটু চিন্তান্বিত হইয়াই শয্যায় গা এলাইয়া দিলেন।

বৈকালের দিকে বারান্দায় বসিয়া খবরের কাগজের পাতা উল্টাইতেছেন। চাকর আসিয়া চা দিয়া গেল। বৈকালিক চা ও খাবার সাধারণত ত্রিলোচনবাবুর বধূমাতা অম্বুভা পরিবেশন করিয়া থাকেন। ব্যতিক্রম দেখিয়া ত্রিলোচনবাবু ডাকিলেন, বৌমা!

ত্রিলোচনবাবুর স্ত্রী অনুপমা ঘরের ভিতর হইতে উত্তর দিলেন, বৌমা বাড়ী নেই।

কোথায়?

এতক্ষণ বোধ হয় ওল্ড থিয়েটারের গ্রীনরুমে।

ব্যাপার কি?

ব্যাপার আবার কি! ওখানে একটা ফাংশন আছে—বিরাট জলসা!

রমেশ কোথায়?

রমেশও গেছে বৌমার সঙ্গে।

কখন ফিরবে?

তা জানিনে। বিরাট জলসা—কাজেই একটু রাত নিশ্চয়ই হবে।

একটু পরেই ত্রিলোচনবাবু লক্ষ্য করিলেন, অনুপমা বেশ একটু সাজিয়া গুজিয়াই বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। ত্রিলোচনবাবু স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

এ রকম ভাববাচ্যের মানে কি? মেয়েদের কি কোথাও বেরুতে নেই?

না, না, তা নয়। মানে, কোথায় যাচ্ছ?

আজ আমাদের সধবাতারিণী সঙ্ঘের বার্ষিক অধিবেশন। অনেক কাজ, একটু সকাল সকালই যেতে হচ্ছে। আজ তো তোমার ছুটি। রাত্রের ব্যবস্থাটা একটু দেখো।

এই কথা বলিয়া অনুপমা একটু দ্রুতপদেই বাহির হইয়া গেলেন।

ঘেণ্টু চাকরের সহিত একটু বেড়াইয়া আসিয়া বিস্কুট ও লজেন্স মুখে পুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কখনও ঘরে, কখনও বাহিরে, কখনও মাকে কখনও ঠাকুমাকে খুঁজিতেছে। আবার কখনও ঘরের কোণে বসিয়া খেলনা লইয়া খেলিতেছে।

ত্রিলোচনবাবু চিন্তা করিয়া দেখিলেন, শুধু তাঁহারই কোন ফাংশন নাই। কিছুক্ষণ বারান্দায় পায়চারি করিয়া ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিলেন, আজ আর অন্য কিছু রান্না হবে না। বড় এক হাঁড়ি খিচুড়ি চড়িয়ে দাও। ফাংশন সেরে তেতে পুড়ে যে যখন আসে, একথালা করে খিচুড়ি বেড়ে দিও। সঙ্গে কিছু বেগুন-ভাজা করো। চাল, ডাল, ঘি আর যা যা লাগে ভাঁড়ার থেকে বের করে নাও গে।

ঠাকুর মাথা চুলকাইতে লাগিল।

ত্রিলোচনবাবু বলিলেন, কি, কথা বলছ না যে!

ঠাকুর তখনও নীরব। ত্রিলোচনবাবু বলিলেন, কি, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে যে?

আজু মোর গুটিয়ে ফংশন অছি।

তোমারও ফাংশন! কি ফংশন, শুনি?

আজ রাতে পাচক সঙ্ঘের যাত্রাভিনয়।

কি পালা হবে?

সীতার বনবাস।

তোমার পার্ট আছে না কি?

হ। মুই সীতা সাজিবি।

বেশ করিবি। যাও, বেরোও।

ঠাকুর ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইল।

ত্রিলোচনবাবু অগত্যা চাকর যদুকে ডাকিয়া বলিলেন, কি রে, পারবি দুটো চাল-ডাল চড়িয়ে দিতে? এই কথা বলিযাই তিনি যদুর দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া গেলেন! গাযে ফর্সা ধবধবে পাঞ্জাবি, মাথায় চকচকে টেড়ি, পায়ে পাম্প-সু। ত্রিলোচনবাবু অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। যদু ঘাড় নিচু করিয়া নিবেদন করিল, আমার একটা জরুরি ফাংশন আছে। এখুনি যেতে হবে।

কোথায়, কি ফাংশন?

ইস্টার্ন পার্কে লারে-লাপ্পা সঙ্ঘের ত্রৈবার্ষিক হুল্লোড়। আমার এমনিই বড় দেরি হয়ে গেছে। আমি এখনি যাচ্ছি।

এই কথা বলিয়া যদু ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। ত্রিলোচনবাবু ভাবিতেছেন, তাই তো। সব বেরিয়ে

গেল। এখন আহারাদির কি হবে? ফাংশনই করুক আর যাই করুক, খিদে নিশ্চয়ই পাবে। হয়তো এর মধ্যে কেউ কেউ কিছু চা বা খাবার পেলেও পেতে পারে, কিন্তু তাতে কি আর রাত্রের খাওয়া বাদ দেওয়া যাবে? একবার ভাবিলেন, নিজেই কিছু রান্নার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সেটা সম্ভব মনে হইল না। উনানই ধরাইতে পারিবেন না। কিছুক্ষণ চিন্তার পর নিকটবর্তী একটি খাবারের দোকানে অর্ডার দিয়া দুইশত খানা লুচি এবং দুই সের আলুর দম আনাইয়া রাখিলেন।

রাত্রি নয়টার পর হইতে এক একজন করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। অনুপমা আসিলেন, ভীষণ শ্রান্ত। দিদি আসিলেন প্রায় মুমূর্ষু। অনুভা আসিলেন, ভয়ানক ক্লান্ত। ছেলেরাও একে একে ফিরিয়াছে, কাহারও কথা বলিবার সামর্থ্যও যেন নাই। ত্রিলোচনবাবু অনুপমাকে বলিলেন, যাও, এদের নিয়ে কিছু খাইয়ে দাও। ওঘরে লুচি আর আলুর দম আছে।

লুচি-আলুর দম কেন?

ঠাকুর আর চাকরেরও আজ ফাংশন ছিল। তারা এখনও ফেরেনি।

সকলেই কাপড় ছাড়িয়া কোনমতে দু'চার-দশখানা লুচি মুখে পুরিয়া বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

অনুভা ডাকিলেন, ঘেণ্টু!

কোন উত্তর নাই।

এঘর ওঘর খুঁজিয়া ঘেণ্টুকে পাওয়া গেল না। সকলেই অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। অনুভা বলিলেন, আমি ভাবলুম, ও মায়ের কাছে থাকবে। অনুপমা বলিলেন, আমি ভাবলুম, ও ঠাকুরঝির কাছে থাকবে। দিদি বলিলেন, আমি ভাবলুম, ও দাদুর কাছে থাকবে। এতক্ষণ নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে।

ত্রিলোচনবাবু একান্ত অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। বলিলেন, সন্ধ্যার পর পর্যন্তও তো দেখেছি তাকে। কখন হয়তো আমার একটু তন্দ্রা এসে পড়েছিল। কিন্তু যাবে কোথায়?

অনুপমা বলিলেন, ঠাকুর চাকর কিছু করেনি তো?

ত্রিলোচনবাবু বলিলেন, আমার তা মনে হয় না। তারা আমার সামনেই খালি হাত পায়ে বেরিয়ে গেছে, আমি ভাল করেই দেখেছি। তাদের বেরিয়ে যাবার পরেও দেখেছি, ঘেণ্টু ঘরে তার ইঞ্জিন নিয়ে খেলছে।

বাড়ীতে কোথাও ঘেণ্টুকে পাওয়া গেল না দেখিয়া ত্রিলোচনবাবু অগত্যা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া লালবাজারে খবর দিলেন।

ইনস্পেক্টর সমরেশ চৌধুরী যেমন সাহসী, তেমনি অনলস এবং কর্তব্যপরায়ণ। তিনিই এই অনুসন্ধানের ভার লইলেন। প্রথমেই সমস্ত থানায় ফোন করিয়া দিলেন। শেষে ছয়জন কনস্টেবল সহ একটি রেডিও-বসান গাড়িতে বাহির হইয়া পড়িলেন। সম্মুখে তীব্র হেডলাইট এবং দুই পাশে ও পিছনে অত্যন্ত জোরালো ছয়টি টর্চ ফেলিতে ফেলিতে তাঁহারা কলিকাতার রাস্তার দুপাশ খুঁজিতে লাগিলেন। ঘেণ্টুর পরনে ছিল একটি লাল গরম কোট। লাল রংয়ের কিছু দেখিলেই গাড়ি তৎক্ষণাৎ থামিয়া পড়ে। এমনি করিয়া ইনস্পেক্টর চৌধুরী কলিকাতার, বিশেষত তালতলা অঞ্চলের পথগুলি খুঁজিতে লাগিলেন। একটি সিনেমা গৃহের সম্মুখে সহসা গাড়ি থামিয়া গেল। একটি টর্চের সামনে একটি লাল রংযের জামা দেখা গিয়াছে। ইনস্পেক্টর চৌধুরী টর্চ হাতে লাফাইয়া পড়িলেন। কনস্টেবলরাও সঙ্গে চলিল। সিনেমা গৃহের বিপরীত ফুটপাথের পাশে একটি বাড়ির দেওয়াল ঘেঁষিযা একটি জামা পড়িযা আছে। নিকটে গিযা সমরেশ বাবু দেখিলেন, একটি ছোট ছেলে ঘুমাইযা আছে। একটি কনস্টেবল বলিল, মনে হচ্ছে, বাচ্চাটি মরে গেছে।

ইনস্পেক্টর চৌধুবী তাডাতাডি ছেলেটির বুকে হাত দিযা দেখিলেন, ছেলেটি সম্পূর্ণ জীবিত এবং গাঢ ঘুমে অচেতন। সমবেশবাবু আস্তে আস্তে ছেলেটিকে কোলে তুলিযা লইযা মাথাটা একটু ঝাঁকাইতেই খোকাব ঘুম ভাঙিযা গেল। সমরেশ বাবু জিজ্ঞাসা কবিলেন, খোকা, তোমাব নাম কি?

খোকা সপ্রতিভভাবেই উত্তব দিল, ঘেন্টু।

সমবেশবাবু এবং অপর সকলেই আশ্বস্ত হইযা খোকাকে কোলে করিযা গাডিতে তুলিযা লইযা তালতলাব ত্রিলোচনবাবুব বাডির দিকে ছুটিলেন।

গাডিতে সমবেশবাবু খোকাকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, খোকা তোমাকে এখানে কে আনল?

কে আবাল আনবে? আমিই এচেচি।

কেন এখানে এলে?

ভগবতী ছিনেমায ফাংতন থিল কিনা।

তা, ফাংশনে গেলে না কেন?

তিকিত থিল না। তাই মাইকে থুনথিলুম।

কি শুনছিলে?

বলে গোলামালি মিয়াল থেযাল। থুনতে থুনতে ঘুমিযে পলেছিলাম।

গাড়ি ত্রিলোচনবাবুর বাড়িতে পৌঁছিলে ঘেণ্টুকে লইয়া হুলস্থূল পড়িয়া গেল।

ত্রিলোচনবাবু তাড়াতাড়ি একখানা একশত টাকার নোট লইয়া সমরেশবাবুকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া তাঁহার হাতে দিতে গেলেন। সমরেশবাবু বিনীতভাবে উহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, আমি আমার কর্তব্য করেছি মাত্র। এই কথা বলিয়া তিনি খোকাকে একটু আদর করিয়া গাড়িতে চড়িয়া অন্তর্হিত হইলেন।

ত্রিলোচনবাবু রীতিমত বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, ফ্যাশন আর ফ্যাশন। পেটে যত পিত্তি পড়ছে, মাথায় ততই ফ্যাশনের চারা গজাচ্ছে।

ত্রিলোচনবাবুর কথায় উত্তর দিবার বা তর্ক করিবার মত উৎসাহ বা শক্তি কাহারও ছিল না। ঘেণ্টুকে কিছু খাওয়াইয়া অনুভা তাহাকে কোলে করিয়া শুইতে গেলেন। অপর সকলেও নিজ নিজ বিছানায় গিয়া ঢলিয়া পড়িলেন। ঠাকুর ও চাকরের কোন সাড়া সে রাত্রে পাওয়া গেল না।

জানুয়ারি, ১৯৫৫

তত্ত্ব কথা

আজ মাস-পয়লা। প্রফুল্লবাবু প্রফুল্লমনে বাড়ী ফিরিয়াছেন। গৃহিণী প্রফুল্লমুখে আপ্যায়ন করিয়াছেন।

কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া পাখাটা একটু খুলিয়া দিয়া ইজিচেয়ারে গা এলাইয়া প্রফুল্লবাবু বিশ্রাম করিতেছেন। এক প্লেট খাবার ও চায়ের পেয়ালা লইয়া গৃহিণী চঞ্চলা একটি টিপয়ের উপর রাখিয়া টিপয়টি প্রফুল্লবাবুর দিকে আগাইয়া দিলেন। প্রফুল্লবাবু ধীরে ধীরে জলযোগে মনোনিবেশ করিলেন। জলযোগ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময়ে চঞ্চলা বলিলেন, আজ ঠাকুরঝি এসেছিলেন।

তাই নাকি? কেমন আছেন ওঁরা সব? ভাল আছেন তো?

হ্যাঁ, ভালই আছেন।

কিছু বলতে এসেছিলেন?

না, এমন বেশি কিছু নয়। ওঁর নাতির ভাত। তাই নেমন্তন্ন করতে এসেছিলেন।

কার? সমীরের ছেলের?

হ্যাঁ।

কি আশ্চর্য! এই সেদিন দেখলুম সমীর হকিস্টিক নিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে, আর এরই মধ্যে—

আশ্চর্য হবার আর কি আছে? তিন বছর হল ওর বিয়ে হয়েছে।

তা হবে।

চঞ্চলা বলিলেন, ভাতে কি দেওয়া যায়?

একটা খেলনা-টেলনা—

কি যে বল, তার ঠিক নেই। ঠাকুরঝির প্রথম নাতি, আমাদের কত আদরের সমীর।

তা হলে?

সরু একছড়া মফ্‌চেন হলেই ভাল হয়।

তার মানে দু'শো টাকা!

সে আমি দেখব'খন। অত টাকা তোমার লাগবে না। ও আমি দেড়শ' টাকার মধ্যেই করিয়ে নেব। দিনকাল বুঝে চলতে হবে তো ?

বেশ, তাহলে তাই কর।

মাসের চৌঠা। প্রফুল্লবাবু অফিস যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। চঞ্চলা চঞ্চল পদে আসিয়া বলিল, তুমি তো চল্লে অফিসে, যত জ্বালা হয়েছে আমার।

কি জ্বালা হল ?

কাল বিকেলে অমিয়া এসেছিল।

অমিয়া ? তারা সব ভাল আছে ?

হ্যাঁ, ভাল আছে। অমিযার মেয়ের সাধ আজকে।

বেশ, যাও, ঘুরে এসো। অনেক দিন যাওনি।

খালি ঘুরে এলেই তো হয না। আমার ওই একটি মোটে বোন। লোকের কত থাকে।

তা, অত ভাবনার কি হ'ল ? একখানা শাড়ী চাই ? কত টাকা হলে হবে ?

সে তোমার ইচ্ছে।

তিরিশ টাকার মধ্যে হবে না ?

তা আর হবে না কেন ? সাত টাকাযও হয়। আমার বেলাতেই তোমার যত কিপটেমি।

আচ্ছা, বলই না, কত হ'লে মোটামুটি একখানা ভাল কাপড হয ?

সত্তর আশি টাকার কমে কি ভাল শাডী হয ?

প্রফুল্লবাবু মনের অপ্রফুল্লতা গোপন করিযা বলিলেন, বেশ, তোমার পছন্দমত একখানা কাপড় বরং তুমি নিজেই কিনে নিযে এস। কাছেই দোকান—

চঞ্চলা আশ্বস্ত হইলেন। প্রফুল্লবাবু অফিস চলিয়া গেলেন। চঞ্চলা যথাসময়ে সাজিয়া-গুজিয়া ছোট ছেলে কল্যাণের সঙ্গে একটি কাপড়ের দোকান হইতে পছন্দমত একখানা শাড়ী আশি টাকা দিয়া কিনিয়া অমিয়ার বাড়ীর দিকে যাত্রা করিল।

মাসের আটই। প্রফুল্লবাবু অফিস হইতে ফিরিয়া জলযোগাদি করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। দুপুর ও বৈকালে ডাকে কয়েকখানি চিঠি আসিয়াছিল। তাঁহার কন্যা অমিতা সেগুলি আনিয়া প্রফুল্লবাবুর পাশের টিপয়ের উপর রাখিয়া গেল।

প্রফুল্লবাবু দেখিলেন, চিঠিগুলির মধ্যে একখানি বড় চৌকো এনভেলপ, লাল কালিতে ঠিকানা লেখা। চিঠির কোণে লেখা—শুভ-বিবাহ। চিঠিখানি খুলিয়া পড়িয়া

দেখিলেন, তাঁহারই অফিসের একজন পদস্থ কর্মচারীর পুত্রের বিবাহোপলক্ষে প্রীতি-সম্মেলন। প্রফুল্লবাবু পত্রখানি হাতে লইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাইতো। 'লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদ প্রার্থনায়' হইলেও এস্থলে খালি হাতে যাওয়া চলিতে পারে না। যখন অফিসের সকলেই একটা কিছু লইয়া উপহার দিবেন, তখন তিনি কেমন করিয়া খালি হাতে থাকিবেন? সুতরাং কিছু একটা লইয়া যাইতেই হইবে। একেবারে যা তা দেওয়া যায় না। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া শেষ পর্যন্ত একছড়া নকল মুক্তার হার দেওয়াই স্থির করিলেন। কত আর দাম হইবে? একশ' সওয়া শ'য়ের মধ্যেই হইয়া যাইবে।

প্রীতি-সম্মেলনে বগলদাবা হইতে একটি চকচকে চ্যাপ্টা বাক্স লইয়া একপাশে একটু মুখটি খুলিয়া যখন হারের বাক্সটি নববধূর হাতে দিলেন, তখন পার্শ্ববর্তী মেয়েরা সোৎসুক নেত্রে চাহিয়া দেখিল, একটি মেয়ে খাতা পেন্সিল হাতে প্রফুল্লবাবুর নামটি জানিয়া লইয়া হারগাছি তালিকাভুক্ত করিল। প্রফুল্লবাবু প্রফুল্লচিত্তে এদিক-ওদিক একটু চাহিলেন এবং তাঁহাদের অফিসের দুই একজন কর্মচারী তাঁহার এই উপহারটি লক্ষ্য করিযাছে দেখিয়' পরম পুলকিত হইলেন।

আজ মাসের তেরই। সন্ধ্যার পর অমিতা তাহার মাতাকে বলিল, মনে আছে তো?

কি?

আমার কোন্ কথাটাই বা তোমার মনে থাকে?

কেন, কি কথা বল্ না। দেখতেই পাচ্ছিস, আমার কি একটু অবসর আছে?

কাল আমাদের ক্লাসের নমিতার জন্মদিন। আমাকে অনেক বার করে বলেছে যেতে।

চঞ্চলার মনে পড়িল, অমিতা ও নমিতা বহুদিন হইতে সখিত্ব পাতাইয়াছে। কতদিন উহারা পরস্পরকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওইয়াছে, পরস্পরের সুখ-দুঃখের সাথী হইয়াছে। সুতরাং নমিতার জন্মদিনে একটু ভাল কিছু উপহার না দিলে নমিতাই বা কি মনে করিবে, আর অমিতারই বা ভাল লাগিবে কেন? তাই অমিতা তার মাকে ধরিয়াছে, বাবাকে বলিয়া কিছু ব্যবস্থা করিতে।

চঞ্চলা প্রফুল্লবাবুকে সবিশেষ নিবেদন করিলেন। প্রফুল্লবাবু বলিলেন, তা, বেশ, একটা কিছু দাও। আচ্ছা, একখণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলী দিলে হয় না?

চঞ্চলা বলিলেন, বই অনেকবার দেওয়া হয়েছে। একটু ভাল কিছু না দিলে এবার অমিতার মন খুশী হবে না।

তা হলে একখানা শাড়ীই দাও।

হ্যাঁ, আমিও তাই ভাবছিলাম।

তাই দাও। ত্রিশ চল্লিশ টাকার মধ্যেই হবে, কি বল ?

হ্যাঁ, তা বই কি। তবে কিনতে গেলে দশ পাঁচ টাকা এদিক-ওদিক হতে পারে।

তা পারে। আচ্ছা, তাই করো।

চঞ্চলা অমিতাকে বসিল উপহারের কথা। অমিতা আহ্লাদে নাচিতে লাগিল। পরদিন মহানন্দে নমিতাকে গিয়া শাড়ী উপহার দিল। নমিতার মাতা কাপড় দেখিয়া পরম আনন্দিত হইলেন এবং নমিতাকে বলিলেন, আজ তুই এই শাড়ীখানাই পরে থাক, সবাই দেখুক। নমিতা নূতন কাপড় পরিয়া অমিতাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, কেন ভাই, এত খরচ করে কাপড় কিনলে ? আজকাল অযথা খরচপত্র করতে নেই।

মাসের আঠারই সন্ধ্যার পর।

চঞ্চলা ধীরে ধীরে প্রফুল্লর কাছে আসিয়া বলিলেন, বেশ আছ যা হোক। যত জ্বালা হয়েছে আমার।

কি হল ?

হবে আবার কি ? পাঁজি দেখেছ ?

পাঁজি ?

হ্যাঁ, আসছে রবিবারে জামাই-ষষ্ঠী না ?

ও, হ্যাঁ, তাহলে আজই তাদের বলে আসতে হয়, কি বল ?

বলে এলেই সব হয়ে গেল ?

না, তা নয়। তারপরে মোটামুটি গুছিয়ে টুছিয়ে—

একটু হিসেব করে দেখলে হ'ত না ?

প্রফুল্লবাবু এক টুকরো কাগজ ও পেন্সিল লইয়া একটা ফর্দ করিলেন। চঞ্চলা যথারীতি সেটা অদল বদল করিলেন। প্রফুল্লবাবু বলিলেন, তাই তো, এযে দেখছি, শ'-তিনেকের ধাক্কা।

চঞ্চলা চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, ধাক্কা মানে? বছরের একদিন জামাইকে একটু আদর যত্ন করবে, সেটা হ'ল তোমার কাছে একটা ধাক্কা! আর ওদিকে কতদিকে কত বেরিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া মনে পড়ে গেল বছর বেয়ানের সেই ঠোঁট-উল্টানো ?

প্রফুল্ল বলিলেন, কতদিক মোটেই নয়। সবই ওই এক দিক।

কোন্ দিক শুনি? তবু যদি বছরে বছরে সোনা-দানা কিছু অঙ্গে উঠতো।

আচ্ছা গো আচ্ছা! তা হ'লে এখন থেকেই খুচরো জিনিসগুলো যোগাড় করে ফেল।

চঞ্চলা বলিলেন, যোগাড় কি দিয়ে করবো?

কেন? আজ মাত্র আঠারই।

আমার কাছে যা আছে, তাতে বাকী ক'দিনের বাজার খরচই চলবে না।

তা হলে?

প্রফুল্লবাবু অনেক চিন্তা করিলেন। প্রফুল্লবাবু বেতন মন্দ পান না। কিন্তু ছাপোষা-মানুষ, মনটাও একটু দরাজ, খরচপত্রের সূক্ষ্ম হিসাব রাখতে পারেন না। অনেকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন। দেখ, আমার ইন্‌সিওরের বার্ষিক প্রিমিয়াম এমাসেই দেওয়ার কথা। তবে এক মাস গ্রেস আছে। না হয় সামনের মাসেই দেব।

চঞ্চলা বলিলেন, কি আর বলব আমি। টাকা পয়সা তো তুমিই আনছ, তুমিই খরচ করছ। একটু বুঝে সুঝে—

বোঝা-সোঝা চিরকালই হচ্ছে।

প্রফুল্লবাবু আলমারি হইতে তাঁহার বার্ষিক প্রিমিয়ামের টাকা বাহির করিয়া চঞ্চলার হাতে দিলেন। অত্যন্ত গম্ভীর ও বিষন্নমুখে চঞ্চলা আগামী রবিবারের উৎসবের আয়োজনে মন দিলেন।

মাসের আজ পঁচিশে।

চঞ্চলা নিশ্চল হইয়া মুখ ভার করিয়া বসিয়া আছে। প্রফুল্লবাবু অফিস হইতে ফিরিয়া চঞ্চলার গম্ভীর মুখ দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হয়েছে?

হবে আবার কি?

অসুখ টসুক? সেই ফিক্ ব্যথাটা বাড়েনি তো?

না, না।

এই কথা বলিয়া চঞ্চলা একখানি লাল এনভেলপ প্রফুল্লবাবুর হাতে দিয়া বলিলেন, বড়দার মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।

বিয়ে কবে?

পরশু।

তাই তো!

তা তুমি যাই বল, একটু সোনা না ছুঁইয়ে আমি পারব না।

প্রফুল্ল সত্যই চিন্তিত হইল। সর্বদাই তার যত্র আয়, তত্র ব্যয়। অথচ তত্ত্বতল্লাস একটু করিতে না পারিলে মনুষ্য সমাজে বাস করা যায় না। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া বলিলেন, এক কাজ কর। আমার দু সেট সার্টের হাতার বোতাম আছে। কফওয়ালা সার্ট কেউ বড় একটা পরে না। আমার সার্টের তো হাতই নেই। কি হবে বোতামগুলো দিয়ে?

তাই বলে তোমার হাতের বোতামগুলো এমনি করে—

কি আর করা যাবে। সমাজে থাকতে গেলে—

চঞ্চলা একটু ভাবিলেন। তারপর বলিলেন, আমার একটা লকেট আছে সেটাও আমি আর পরিনে। এইগুলো মিলিয়ে যদি একটা কিছু করে দেওয়া যায়—

তাই কর। সমাজে বাস করতে গেলে—

ভাইঝির বিবাহের দিন চঞ্চলা একটি মখমলের বাক্সে একটি পাথর বসান লকেট-হার লইয়া উপহার দিয়া আসিলেন। মনে হর্ষ-বিষাদের একটা অদ্ভুত সংমিশ্রণ।

আজ মাসের একত্রিশে। সকালে উঠিয়া চঞ্চলা তাঁহার হাতবাক্সের ডালা তুলিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া বিষণ্ণমুখে বসিয়া রহিলেন। প্রফুল্লবাবু কাছে আসিয়া বলিলেন, আজ আবার কি হ'ল?

হ'ল আমার মাথা।

কারো বিয়ে নাকি? না, কারো মুখে ভাত?

আমাদের মুখে ভাত উঠবে কি করে তাই ভাবছি।

একেবারেই খালি? বাজারের টাকাটাও নেই?

বাজারের টাকা থাকলে আর অত বসে ভাবব কেন?

প্রফুল্লবাবু তৎক্ষণাৎ সার্টটি পরিয়া বাহির হইয়া গেলেন এবং নিকটবর্তী এক আত্মীয়ের কাছে গিয়া বলিলেন, ভাই, আজ মাসের শেষ দিন, একখানা দশটাকার নোট দেবে? কালই দিয়ে যাবো।

দশ টাকার নোটখানি চঞ্চলার হাতে দিলেন।

চঞ্চলা বলিলেন, কোথা থেকে আনলে টাকা?

প্রফুল্লবাবু আত্মীয়ের নাম বলিলেন। চঞ্চলা বলিলেন, ছি, ছি, লজ্জা করলো না?

কি আর করি বল? সমাজে বাস করতে গেলে—

চঞ্চলা বাজারের ফর্দ করিতে লাগিলেন।

চক্র

কার্জন পার্ক। সন্ধ্যা হইয়াছে। শরতের স্নিগ্ধ আকাশে কয়েকটি তারা এইমাত্র উঠিয়াছে। কিন্তু তাহাদের আলো ম্লান হইয়া গিয়াছে চঞ্চল নগরীর বিবিধ আলোক-মালায়। গৃহের আলো, গাড়ীর আলো, বিজ্ঞাপনের আলো প্রভৃতি বিচিত্র আলোর ছটা সমস্ত অঞ্চলটিতে অপূর্ব শোভা বিস্তার করিয়াছে।

পার্কের একখানি বেঞ্চিতে বসিয়া মিস অরুণা রায়। একটি বড় হাসপাতালের নার্স। তাহার পাশে বসিযা তরুণ ডাক্তার দিলীপ মজুমদার।

বেশ কিছুক্ষণ তাহারা বসিয়া আছে। কথা বলিতেছে অতি অল্প।

অরুণা একবার বলিল, তাহলে তুমি কিছুতেই রাজী নও।

দিলীপ বলিল, আমি তো বলেছি। বিলেত থেকে ফিরে এলে আমাদের বিয়ে হবে। সেইটাই ভাল ব্যবস্থা।

কিন্তু কেন তোমার আপত্তি এখন বিয়ে করতে তা আমি বুঝতে পারছিনে।

বিয়ে করেই ছাড়াছাড়ি সেটা কি ভাল?

ক্ষতিই বা কি? আমাদের এতদিনের পরিচয়, এত ঘনিষ্ঠতা। এতে বিবাহটাই স্বাভাবিক নয় কি? আমাদের পরিচিত যারা, সকলেই এটা আশা করে না কি?

অপরের কথা থাক।

আচ্ছা, অপরের কথা ছেড়েই দিচ্ছি। তুমি যখন বলেছ, বিয়ে করবে, তখন শুধু শুধু দীর্ঘ দুটো বছর আমাকে কষ্ট দেবে কেন? তা-ছাড়া ওখানে গেলে হয়তো তোমার ফিরতে দেরি হয়ে যেতে পারে। পরীক্ষায় পাশ করা সব সময়ে তো নিজের ইচ্ছেমত হয় না।

হ'লই বা দেরি। আমরা পরস্পরকে সর্বদা চিঠি লিখব। পরস্পরকে মনে রাখব। ঠিক বিয়ে হলে যেমন করতুম।

তা কি হয়? তুমি বড়ই অবুঝের মত কথা বলছ। সেখানে গিয়ে কত লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হবে। দুদিন পরেই আমাকে ভুলে যাবে।

কখনও না।

অমন সবাই বলে। কিন্তু কাজের বেলায় ক'জনের কথার ঠিক থাকে? হাজার হোক মানুষের মন। বিশেষত পুরুষ মানুষের মন।

থাক, আর বড়াই করতে হবে না। তোমার মন যদি ঠিক থাকে, আমার কেন থাকবে না?

সবই যদি ঠিক থাকে, তা'হলে বিয়েতেই বা অমত কেন?

বলেছি তো, বিয়ে করেই ছাড়াছাড়ি, আমার ভাল লাগবে না।

অরুণা বলিল, তোমার আপত্তির কারণ সত্যই আমি বুঝতে পারছিনে। তোমার মত বা ইচ্ছা কি বদলে গেছে? আমাকে সত্য কথা বলতে বাধা কি?

কি যে বল, তার ঠিক নেই।

কি আর বলব, বল। তুমি যখন নিতান্তই পণ করেছ, এখন বিয়ে করবে না, তখন আমার আর কি বলবার আছে? কবে তুমি রওয়ানা হচ্ছ?

সব গুছিয়ে টুছিয়ে নিতে প্রায় দুই মাস লাগবে।

যাত্রার দিন জানতে পারব তো?

নিশ্চয়ই। যাত্রার দিনের আগে বুঝি আর আমার সঙ্গে দেখা করবে না?

দেখা করা না করা কি শুধু আমার ইচ্ছের উপর নির্ভর করে?

দেখা হবে। নিশ্চয়ই হবে।

আচ্ছা, আজ তাহলে আমরা উঠি।

এই কথার পর তাহারা ধীরে ধীরে এসপ্লানেডের মোড়ে আসিয়া দুইখানি বিভিন্ন ট্রামে উঠিয়া বসিল। ডবল ঘণ্টা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে ট্রাম দু'খানি গন্তব্যস্থানে যাত্রা করিল।

২

মিঃ এস. কে. গাঙ্গুলী, বার-এট-ল। তাঁহার কন্যা মিস আভা গাঙ্গুলী! গত বৎসর বি-এ পাস করিয়াছে। রূপসী ও বুদ্ধিমতী আভা সন্ধ্যার পর ড্রইংরুমের এক পাশে বসিয়া পিয়ানোর উপর আঙ্গুল বুলাইতেছে। তাহার মাতা একখানি সোফায় বসিয়া উল বুনিতেছেন। তীব্র ঈষৎ-নীল বৈদ্যুতিক আলোয় সমগ্র ঘরের আসবাবপত্র ঝকমক করিতেছে।

আস্তে আস্তে ঘরে প্রবেশ করিলেন ডাক্তার দিলীপ মজুমদার।

মিসেস গাঙ্গুলী বলিলেন, এই যে এস, বাবা, এস।

দিলীপ একখানি সোফায় ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল। বলিল, আপনারা সব কেমন আছেন?

আছি বাবা ভালই। তা তোমার খবর কি? কবে বোট ধরছ?

প্রায় মাস দুই আছে। আপনারা আমাদের বিষয়টা কি ভেবে দেখেছেন?

দেখেছি বৈ কি। উনি তো কালই বিয়ে দিতে রাজী। কিন্তু কি যে একগুঁয়ে মেয়ে!

কেন ওর এত আপত্তি?

কি জানি বাপু। বলে, বিলেত থেকে ফিরে আসুন, তারপর বিয়ে হবে।

ইতিমধ্যে আভা পিয়ানোর শব্দ বন্ধ করিয়া উৎকর্ণ হইয়া বসিয়াছে। একটু পরে উঠিয়া আসিয়া মিসেস গাঙ্গুলীর পাশে বসিল।

মিসেস গাঙ্গুলী বলিলেন, নাও, তোমরা বোঝাপড়া কর বাপু। আমি আর কি বলব?

আভা বলিল, তুমি আবার কি বলবে মা? আমাদের সব কথাই হয়ে গেছে।

মিসেস গাঙ্গুলী বলিলেন, শোন কথা। সব কথাই নাকি হয়ে গেছে। কথা কখনো শেষ হয়?

এই কথা বলিয়া মিসেস গাঙ্গুলী উল এবং কাঁটা হাতে করিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন।

দিলীপ বলিল, বেশ পিয়ানো বাজাচ্ছিলে, উঠে এলে কেন?

অন্যায় করেছি?

উঠে এসে মোটেই অন্যায় করনি। কিন্তু অন্যায় করেছ তুমি আমাদের বিয়ে বন্ধ করে।

বন্ধ তো করিনি। বিয়ে করেই ছাড়াছাড়ি আমার ভাল লাগে না।

ছাড়াছাড়ি কেন হবে? প্রত্যেক মেলেই আমরা চিঠি লিখব। এখন এয়ার-মেলে চিঠি আসতে মোটেই দেরি হয় না।

তুমি কতদিন ওখানে থাকবে, কত লোকের সঙ্গে মিশবে—

ও! তোমার বুঝি সেই ভয় হয়েছে!

ভয় হয়নি। তবে ভাবনা হয় বৈ কি।

দু-তিনটে বছর বৈ তো নয়। সর্বদা আমরা পরস্পরকে পরস্পরের খবর দেব, মনের কথা লিখব।

সব কথা কি আর কেউ লেখে?

নিশ্চয় লেখে। আমরা নিশ্চয়ই লিখব। তুমি বিয়েতে আর আপত্তি ক'র না।

আপত্তি আমি করেছি। আপত্তি করব। তুমি আগে পাশ-টাশ করে ফিরে এস তারপর সব হবে।

আমার মনটা কিন্তু বড় ব্যস্ত হয়েছে।

বেশ মনে কর, আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে।

তা কি মনে করা যায়! দেখ, ঠিক এই কথা নিয়ে আমাদের অনেকবার আলোচনা হয়ে গেছে। সত্যি বার বার এক কথা নিয়ে আলোচনা করলে শেষে তোমারও ধৈর্যচ্যুতি হবে।

রাগ করছ বুঝি?

না, না। রাগ করব কেন? আমি সত্যিই যা ভাল মনে করেছি, তাই তোমাকে বলেছি। তুমিও আর একটু ভেবে দেখ। শুধু শুধু আমার 'পর রাগ ক'র না।

রাগ করব কেন? তবে তুমি একটু দুঃখ আমাকে দিচ্ছ এবং তাও বিনা কারণে।

সব কাজের সব কারণ কি সব সময়ে বোঝা যায়?

তা অবশ্য যায় না। কিন্তু আমি অনেক ভেবে দেখেছি, আমাদের বিয়ে বন্ধ করার কোন কারণই খুঁজে পাইনি।

কিন্তু আমারও একটা মতামত আছে। আমার বিশ্বাস, এখন আমাদের বিয়ে না হলেই ভাল হয়।

তোমার যদি তাই সিদ্ধান্ত হয়, তাহলে আর আমি কি বলব?

সত্যি, তুমি রাগ ক'র না। কবে রওয়ানা হচ্ছ? বার্থ পেয়েছ? কোথা থেকে যাবে, কলকাতা থেকে, না বম্বে থেকে?

বম্বে থেকে বোট ধরব। তারিখটা এখনও ঠিক হয়নি।

কবে যাত্রা করবে, জানিও কিন্তু।

কি আশ্চর্য! এমন অনুরোধও শুনতে হ'ল তোমার মুখ থেকে? তোমাকে না জানিয়ে যাত্রা করব? তার কোন মানে হয়?

না, তাই বললাম। আমরা যাব তোমাকে ট্রেনে তুলে দিতে।

নিশ্চয়ই যাবে।

আচ্ছা, একটা গান শোনাবে না আজ?

একটু হাসিয়া আভা ধীরগতিতে পিয়ানোর পাশে বসিল এবং সুমিষ্ট সুরে একখানি গান শেষ করিয়া বলিল, হয়েছে?

হ্যাঁ। আচ্ছা, আসি তা'হলে ?

এস।

ধীর পদক্ষেপে দিলীপ বাড়ীর বাহিরে আসিয়া জনস্রোতে মিশিয়া গেল।

৩

আভার সেজ পিসিমার বাড়ী। পিসিমার নাতনীর মুখে ভাত দেওয়া উপলক্ষে বহু আত্মীয়স্বজন নিমন্ত্রিত এবং একত্রিত হইয়াছেন। অন্নপ্রাশনের বিবিধ প্রকার আচার ও অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে। রেশনের কড়াকড়ি সত্ত্বেও আইন বাঁচাইয়া যথাসম্ভব আদর আপ্যায়নের ব্যবস্থা হইয়াছে। কিছু সঙ্গীতাদিরও আয়োজন হইয়াছে। মোট কথা, পিসিমার বাড়ীখানি বিবিধপ্রকার আনন্দধ্বনিতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

পিসিমার দূরসম্পর্কীয় একটি আত্মীয় মোহিনী সরকার। নামটি ধনপতি সরকার হইলেই হয়তো বেশী মানাইত। ধনী ব্যবসায়ী। বাল্যকালে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করে। অধ্যবসায় এবং ভাগ্য উভয়ে মিলিয়া তাহাকে লক্ষ্মীর বরপুত্ররূপে পরিণত করিয়াছে। দেখিতে যেমন কালো, তেমনি কুৎসিত, বয়সও হইয়াছে অনেক। এখনও অবিবাহিত।

আত্মীয়ের বাড়ীতে ইহার পূর্ব হইতেই আভা ও মোহিনীর পরিচয় হইয়াছিল। কয়েকবার ইহাদের বিবাহের কথাও উঠিয়াছে। কিন্তু কথা বেশী অগ্রসর হয় নাই। পিসিমার বাড়ীতে আসিয়া আভা একবার ভাবিল, সোজাসুজি একবার আলাপ করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি ?

অনেকক্ষণ ধরিয়া সুযোগের অপেক্ষা করিয়া একবার একটু একান্তে পাইয়া আভা বলিল, একটা কথা বলব ? রাগ করবে না তো ?

মোহিনী বলল, কি, বল।

না, বলছিলুম কি, আমাদের যে বিয়ের কথাটা উঠেছিল না ?

হ্যাঁ, উঠেছিল। তোমার পিসিমাও বোধ হয় একবার বলেছিলেন।

তা, তোমার এত অমত হচ্ছে কেন ?

মানে, মত বা অমতের কোন কথাই উঠছে না।

কেন ?

আমি বিয়ে ক'রব না।

কেন ?

সব কথার আবার কেন থাকে না কি ?

বিয়ে সবাই করে। তুমি কেন করবে না ? তোমার এত ধন, ঐশ্বর্য !

আর এই হোঁদলকুতকুতে রূপ ?

আভা বলিল, বাইরের রূপটাই কি বড় হ'ল ?

ভিতরের রূপের কি পরিচয় পেয়েছ তুমি ?

যাও ! তুমি বড় তার্কিক। সত্যি, বিয়ে করতে তোমার আপত্তি করা উচিত নয়। আর বিয়েই যদি কর, তাহলে, আমাদের কথাটা তোমার একেবারে অবহেলা করাও কর্তব্য নয়।

কিন্তু, আমার ইচ্ছে নেই বিয়ে করতে।

এটা কিন্তু খুব অস্বাভাবিক।

তা হ'তে পারে। কিন্তু এটা সত্য কথা।

তবু, আর একবার ভেবে দেখো কিন্তু।

আমার ভাবা হয়ে গেছে।

ইতিমধ্যে পিসিমা হঠাৎ এই পথে আসিয়া পড়ায় তাহাদের কথাবলা বন্ধ হইয়া গেল। পিসিমা বলিলেন, এই যে তোমরা এখানে। যাও, ওদিকে সবার ফটো তোলা হচ্ছে। যাও, সেখানে গিয়ে দাঁড়াও গিয়ে।

৪

মোহিনীর সেজমামিমার বোনঝি রাণু। অদ্ভুত মেয়ে। কলেজে পড়ে, অথচ কি সরল, কি চঞ্চল আর কি হাস্যময়ী। যখন যেখানে থাকে, তাহার চারিপাশে একটা আনন্দের তরঙ্গ ওঠে। কি বাড়ীতে, কি কলেজে, কি আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে, যখন যেখানে যায়, তাহাকে কেউ এড়াইতে পারে না। গানে নাচে ইতিমধ্যেই বেশ খ্যাতি অর্জন করিয়াছে।

মোহিনীর বড়ই ইচ্ছা, রাণুকে বিবাহ করে। সেজমামিমার মারফত তাহার প্রস্তাব রাণুর পিতামাতাকে জানাইয়াছে। কিন্তু বিশেষ ফল হয় নাই। সেজমামিমার বাড়ীতে এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে উহার সহিত আলাপ-পরিচয় হইয়াছে বটে, কিন্তু কোন ঘনিষ্ঠ আলাপের সুযোগ হয় নাই।

একদিন রাণুকে একটি কফি-হাউসে ঢুকিতে দেখিয়া মোহিনী গাড়ী থামাইয়া নামিয়া গেল এবং ধীরে ধীরে কফি-হাউসের মধ্যে ঢুকিয়া রাণুর পাশে গিয়া বসিল।

সময়টা একটু অসময়। বেশী লোক তখন ছিল না। মোহিনী মনে করিল, কথাটা সোজাসুজিই পাড়া যাক।

কফি এবং খান-দুই কেকের টুকরা সামনে রাখিয়া মোহিনী বলিল, আচ্ছা, একটা কথা বলব?

বলুন।

আচ্ছা, আপনার তো বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে শুনলাম। মামিমা বলছিলেন।

রাণু খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসিটা এত জোরে যে, মোহিনী বেশ একটু অপ্রতিভ না হইয়া পারিল না। ধীরে ধীরে বলিল, আপনি এত জোরে হাসছেন কেন?

আমার হাসিই ওই রকম। আপনি জানেন না?

তা, আপনি অত হাসলেন কেন? আপনার বিয়ের সম্বন্ধ কি হচ্ছে না?

বোধ হয় হচ্ছে।

তা, মনে করুন, আমাকে আপনি অনেকদিন থেকে চেনেন।

আপনাকে দেখলে আমার ভয় করে।

সে কি?

যা হয়, তাই বললাম। নিন, কফি খান, জুড়িয়ে যাচ্ছে।

তা খাচ্ছি। আপনার একটু, মানে, সামান্য একটু মত পেলে আমি মামিমাকে দিয়ে—

আমার একটু মতও আপনি পাবেন না। কবে আমার বিয়ে হবে, কি মোটেই হবে না, তার কিছুই ঠিক নেই। ও বিষয় নিয়ে আপনি আর দুশ্চিন্তা করবেন না।

দেখ, তুমি,—ওই যা, আপনাকে তুমি বলে ফেললাম—

তা বেশ করলেন। আপনি আমার চেয়ে কত বড়।

মোটেই না। যাক, যা বলছিলাম। তুমি ছেলেমানুষ, ঠিক বুঝতে পারছ না। সংসারে সব দিকই দেখে-শুনে কাজ করতে হয়। সত্যি, তুমি এত ভাল, এত সুন্দর গান গাও, এত ভাল নাচতে পার। তোমার এত গুণ অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারে এমন লোককেই তোমার বিয়ে করা উচিত।

ঐ, যাঃ।

কি হ'ল?

আজ রাত্রে মিঃ দত্তের বাড়ীতে নাচের জলসা আছে। আমাকে এখুনি যেতে হবে।

চলুন, আমি পৌঁছে দিয়ে আসি। আমার সঙ্গে গাড়ী আছে।

আচ্ছা, চলুন।

গাড়ী গন্তব্য স্থানে পৌঁছিল। পথে কোন কথা হইল না। উভয়েই সম্পূর্ণ নীরব। গাড়ী হইতে যখন রাণু নামিতেছে, তখন মোহিনী বলিল, কথাটা একটু ভাল করে ভেবে দেখ।

আপনি ওসব কথা একেবারে ভুলে যান।

এই কথা বলিয়া রাণু ত্বরিত পদে অদৃশ্য হইয়া গেল।

৫

রাণুর কলেজের তরুণ অধ্যাপক সুকুমার মল্লিক খুব মিশুক, ইংরেজীতে যাকে বলে পপুলার। সকলের সঙ্গেই ভারি সদ্ভাব। মেয়েরা ভারি পছন্দ করে। তিনি এদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করেন, যেন তারা কেউ মেয়ে নয়, সব ছেলের দল। সুকুমারের এই ছাত্রী-প্রীতির খ্যাতি ইণ্টারকলেজিয়েট খ্যাতিতে পরিণত হইযাছে। তিন চারটি কলেজের দশ-বারটি মেয়েকে লইয়া সিনেমায় যাওযা, আর্ট-এগজিবিশন দেখিতে যাওয়া, পিকনিকে যাওয়া প্রভৃতি তাঁহার এখন প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অথচ কি উদার, কি নিরাসক্ত, কি শিষ্ট, কি মিষ্ট!

একদিন একটি পিকনিক-দল বোটানিক্যাল গার্ডেনে গিয়াছে। অনেকক্ষণ হৈ-হৈ করিবার পর একবার রাণু এবং সুকুমার এক ফাঁকে মূল দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইযা বেড়াইতে বেড়াইতে একটু দূরে একটি গাছের গোড়ায় গিয়া গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়া দাঁড়াইল। কিছুদিন পূর্বেকার সিনেমার ছবিতে প্রায়ই এইরূপ একটা দৃশ্য থাকিত।

রাণু বলিল, আপনি বিয়ে করেন না কেন?

যাও! বিয়ে-ফিয়ে আমি করব না।

অমন সবাই বলে।

আমি সবাই নই।

আচ্ছা দেখা যাবে। কোন মেয়েকেই আপনার পছন্দ হয় না বুঝি?

পছন্দ-অপছন্দর কথা উঠছেই না।

ধরুন, যদি আমাকে আপনার পছন্দ হয়।

যাও!

কেন, ছাত্রীতে মাস্টারে বুঝি বিয়ে হয় না। কত তো হয়েছে। নাম বলব, একটা একটা করে—

থাক, নাম বলতে হবে না। সবাই জানে। ভারি নূতন কথা কি না।

তাঁরা বিয়ের আগে নিশ্চয়ই এমনি করে আলাপ-পরিচয় করেছিলেন. এমনি করে বিয়ের কথা আলোচনা করেছিলেন, যেমন আমরা করছি।

আমরা ব'ল না। আমি কিছুই করছিনে।

তা আমার কথাটা দেখুন না একটু ভেবে। আমাকে পছন্দ হয় না বুঝি ? আচ্ছা দেখি আপনার অ্যালবাম।

অ্যালবাম ?

হ্যাঁ। আমি শুনেছি, আপনার পকেটে সর্বদাই একখানা অ্যালবাম থাকে।

তা থাক। তোমাকে দেখতে হবে না।

কেন, দেখিই না। যদি নাই দেখাবেন, তবে পকেটে করে এনেছেন কেন ?

পকেট হইতে একখানি সুদৃশ্য অ্যালবাম বাহির করিয়া সুকুমার রাণুর হাতে দিল। রাণু একটি একটি পাতা উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। সবগুলিই সুকুমারের নিজের হাতে তোলা ফটো। ফটোগুলির নিচে লেখা, পাঠরতা ললিতা, সোপানারোহণরতা যূথিকা, পিকনিকরতা বাণী, সন্তরণরতা রমা, নৃত্যরতা চপলা, গ্রীণরুমে প্রসাধনরতা অলকা, ট্রামারোহিণী কল্যাণী, কাটলেট ভোজনরতা আশালতা, ইত্যাদি ইত্যাদি। ছবিগুলি দেখিয়া রাণু বলিল, আমি কি এদের চেয়ে দেখতে খারাপ ?

কি বলছ তুমি ?

আমাকে আপনার অপছন্দ কিসে তা বলতে হবে।

কি মুশকিল ! ও-সব কথা কেন তুলছ তুমি ? নাঃ, তোমরা দেখছি ভারি মুশকিলে ফেলছ। এই জন্যই তো আমাদের প্রিন্সিপ্যাল বলেন—

কি বলেন ?

থাক, তোমাদের আর সে-কথা শুনে কাজ নেই।

তিনি আপনার অ্যালবাম দেখেছেন ?

তুমি বুঝি গিয়ে চুকলি কাটবে ?

ছিঃ। আমাদের আপনি এত ছোট মনে করেন ? ও-সব কথা থাক। সত্যি বলুন না, আমাকে আপনি পছন্দ করছেন না কেন ?

দেখ, আমি তোমাকে বলছি, তুমি অমন কথা আর আমাকে বলবে না।

'এই কথা বলিয়া সুকুমার পিকনিকের মূল দলে আসিয়া যোগ দিল। রাণুও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেল।

৬

প্রকাণ্ড লাইব্রেরী। শনিবার। অপরাহ্ন। লাইব্রেরী বন্ধ হইবার সময় সন্নিকট।

দুইটি চাপা অথচ তীব্র গলার স্বর শুনা যাইতেছে, লাইব্রেরীর এক কোণ হইতে। দূর হইতে অবশ্য কথা বোঝা যাইতেছে না।

সুকুমার বলিতেছে, ও! কি নিষ্ঠুর তুমি!

বিনতা চৌধুরী বলিতেছে, কি আশ্চর্য!

কেন তুমি কি এখনও বোঝনি আমার মনের সুতীব্র যাতনা?

ভাল মুশকিলে ফেললেন তো দেখি। মেয়েদের অ্যালবাম পকেটে করে ঘুরে বেড়ান আপনি। ভেবেছিলাম আপনি এসবের বাইরে। যাক গে, আপনি চান আমার ফটো আপনার অ্যালবামের জন্য? আমার আপত্তি নেই।

আমি কি ফটো চাইছি?

ফটোতে আর রুচি নেই বুঝি।

তুমি বড় রূঢ় কথা বল।

আপনার মা বাবা আছেন? তাঁদের কাছে গিয়ে বলুন, কিংবা বৌদি-টৌদিকে দিয়ে বলান। তাঁরাই আপনার সুব্যবস্থা করবেন।

তাঁদের মত হলে তোমার মত হবে?

আমার কথা তো উঠছেই না। আপনার ব্যবস্থা তাঁরা করবেন, সেই কথাই বলছি।

আমাদের এতদিনের পরিচয়, এত আলাপ, এত ডিবেট, এস জলসা, এত জয়ন্তী, এত টিউটোরিয়াল ক্লাস, এত—, ও! সব বৃথা, সব অনর্থক, তোমার কাছে।

আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। আপনার সাময়িক মতিভ্রম হয়েছে।

আমার যা ইচ্ছে তাই হোক গে, তোমার কি হয়েছে শুনি?

আমার কিছু হয়নি।

তা তো বলবেই।

উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব। কাহারোই যেন আর কথা বলিবার ইচ্ছা নাই। অথচ উঠিয়া চলিয়া যাইবে, সে শক্তিও যেন নাই।

সুকুমার বলিল, আচ্ছা, আমি যদি নিজে বা আর কাউকে দিয়ে তোমার বাবাকে একথা বলি, তাতে তোমার আপত্তি আছে ?

আছে।

কি আপত্তি ?

কারণ আমার মত নেই।

তোমার বাবার বা মার মত হলেও তোমার মত হবে না ?

না।

আবার দুইজনেই নীরব। মাঝে মাঝে সুকুমার দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে এবং বিনতা সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইতেছে।

একটু পরে দুই একটি দরজা বন্ধ করিবার দুম দাম শব্দ কানে আসিতে তাহারা বুঝিতে পারিল, লাইব্রেরী বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। হাতঘড়ির দিকে চাহিয়া বিনতা বলিল, বড্ড দেরি হয়ে গেল।

সুকুমার বলিল, তাহলে মতটা কি একেবারেই অপরিবর্তনীয় ?

আমাকে বাধ্য হয়েই বলতে হচ্ছে, হ্যাঁ।

লাইব্রেরী-ঘর বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা বাহির হইয়া আসিয়া একজন ট্রামে এবং আর একজন বাসে উঠিয়া স্ব স্ব গন্তব্যস্থানে প্রস্থান করিল।

৭

বিনতা চৌধুরী মাণিকতলার মোড়ে বাসের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া বৃষ্টিতে ভিজিতেছে। এমন সময়ে তাহার পিতার এক বন্ধুর পুত্র মহিম গাড়ী চালাইয়া যাইতেছিল। বিনতাকে ভিজিতে দেখিয়া সে তৎক্ষণাৎ গাড়ী থামাইয়া হাতছানি দিয়া ডাকিতেই বিনতা তাহার গাড়িতে গিয়া উঠিল।

বিনতার সহিত মহিমের পরিচয় অনেক দিনের। কবিতার ভিতর দিয়া উহাদের প্রথম আলাপ। বিনতা কবিতা লিখিত। মহিম তাহার পাল্টা কবিতা লিখিত বা প্যারডি লিখিত। তাছাড়া বিনতা হয়তো কবিতা লিখিল ফুল সম্বন্ধে, অমনি মহিম লিখিত ফল সম্বন্ধে। এমনি করিয়া উহাদের কবিতার খাতার পৃষ্ঠা যেমন ভরিয়া আসিতেছিল, উহাদের মনের ঘনিষ্ঠতাও বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

বিনতা গাড়ীতে উঠিয়া মহিমকে জিজ্ঞাসা করিল, কোনদিকে যাচ্ছেন ?

মহিম বলিল, যাচ্ছি ভবানীপুর। যদি আপনার আপত্তি না থাকে তাহলে একটু গড়ের মাঠের দিক দিয়ে ঘুরে গেলে হয়।

চলুন না। এখনও আপনি আমাকে আপনি বলেন কেন?

তাতে আর কি হয়েছে? আপনার ওই 'আকাশ' কবিতাটার জবাব এখনো তৈরি হয় নি।

তা না হ'ল।

সত্যি, কবিতাটা খুব ভালো হয়েছে। ওর জুড়ি কবিতা আমার দ্বারা হবে বলে মনে হয় না। তবে একটা প্যারডিগোছের কিছু হলেও হতে পারে।

চুলোয যাকগে কবিতা। একটা কাজের কথা বলি আপনাকে।

কি কথা?

মানে, আপনি বিয়ে করছেন না কেন?

হঠাৎ এ কথার মানে কি? ভাল পাত্রীর সন্ধান জানেন না কি?

জানি, তবে আপনার মতে ভাল পাত্রী কি না বলতে পারিনে।

শুনিই না, পাত্রীটি কে।

পাত্রী পছন্দ হলে, আপনি বিয়ে করতে রাজী?

আগে বলুন, কে পাত্রী, কেমন পাত্রী, তবে তো আমার মত বলব?

বিনতা বলিল, আপনি আগে বলুন, পাত্রী পছন্দ হলে আপনি বিয়ে করবেন।

বড়ই মুশকিলে ফেললেন। এমন প্রতিজ্ঞা কি করা যায়?

কেন করা যায় না?

ধরুন, তিনটি পাত্রী পাওয়া গেল, পছন্দমত। তিনটিকে তো বিয়ে করা যায় না।

তিনটির কথা বলছিনে। একটির কথাই বলব।

আপনি হয় তো একটির কথা বলবেন। আর কেউ হয়তো আর একটির কথা বলবে। তখন?

আপনার সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই।

আপনার পাত্রীটি কে শুনিই না। প্রতিজ্ঞাটা আগে থেকে নাই করলাম।

বিনতা একটু গম্ভীর হইয়া গেল। গাড়ীটাও যেন তাহা বুঝিতে পারিয়া একটি রাস্তার মোড়ে থামিয়া গেল। পুলিশ হাত দেখাইয়াছে।

একটু পরে বিনতা বলিল, যদি বলি পাত্রীটি এই গাড়ীতেই বসে আছে।

সে কি? ওকথা তো আমি কখনও চিন্তা করিনি।

আগে করেন নি। এখন চিন্তা করতে দোষ কি?

সে হয় না বিনতা দেবী।

কেন?

এর কোন কেন নেই।

একটু ভেবে দেখুন না। আজই জবাব নাই দিলেন।

আমার জবাব স্পষ্ট। এর অন্যথা হবে না। এ প্রস্তাব আপনি আর কখনও মুখে বা মনে আনবেন না।

গাড়ী রেড রোড ধরিয়া চলিযাছে। মহিম বলিল, আপনিও তো ভবানীপুরেই যাবেন।

হ্যাঁ।

গাড়ী কোথাও না থামিয়া একেবারে বিনতার বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বিনতা নামিয়া যাইতেই মহিম তাহাকে নমস্কার করিয়া গাড়ীতে স্টার্ট দিল।

৮

স্ট্র্যাণ্ড রোড এবং হ্যারিসন রোডের মোড়ে একদিন মহিম একটা দুর্ঘটনায় পড়িল। একখানি লরীর ধাক্কা খাইয়া গাড়ীখানা চুরমার হইয়া গেল।

মহিমের নিজের বহিরবয়বে বিশেষ আঘাত না লাগিলেও তাহার মস্তিস্কে একটা ভীষণ ধাক্কা লাগায় অচেতন হইয়া পড়িল।

একখানি অ্যাম্বুল্যান্স আসিয়া তাহাকে তুলিয়া লইয়া হাসপাতালে ভর্তি করিয়া দিল।

মহিমের আত্মীয়-স্বজন আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহারা উহার জন্য একটি পৃথক ক্যাবিনের ব্যবস্থা করিলেন।

সকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত পালাক্রমে আত্মীযেরা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। শুধু রাত্রিটুকুর জন্য একটি নার্স নিযুক্ত করা হইল।

সম্পূর্ণ তিন দিন মহিম অচৈতন্য হইয়া রহিল। আত্মীয়-স্বজনেরা অত্যন্ত চিন্তাকুল হইলেন। নার্স অরুণা রায় তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, আপনারা ব্যস্ত হবেন না। উনি ঠিক সেরে উঠবেন।

মহিমের মা অরুণার হাত ধরিয়া বলিলেন, আমরা তো কিছু বুঝি না মা। তুমি অনেক রোগী দেখেছ, তুমিই বুঝবে ওর অবস্থা। একটু যত্ন আত্তি ক'র আমার ছেলেকে। তোমার প্রাপ্য পারিশ্রমিকের উপর আরো বখশিশ দেব।

অরুণা বলে, আমার কর্তব্য আমি ক'রব। আপনারা চিন্তা করবেন না।

তিন দিন তিন রাত্রি কাটিবার পর মহিমের জ্ঞান ক্রমশঃ ফিরিয়া আসিতে লাগিল। মহিমের মা পুত্রের জ্ঞানসঞ্চার হইতেছে দেখিয়া পরম আনন্দিত হইলেন। সেদিন রাত্রে বাড়ী ফিরিবার সময়ে তিনি অরুণাকে ডাকিয়া ক্যাবিনের বাহিরে লইয়া গিয়া বলিলেন, তোমার যত্নেই মহিম বেঁচে উঠল। সব সময় কাছে কাছে থেকো। যখন যা চায় দিও।

নিশ্চয়ই। সেকথা আমাকে বলতে হবে না। ডাক্তারেরা বলেছেন, কোন ভয় নেই। কয়েকদিন ভাল করে বিশ্রাম করলেই ঠিক হয়ে যাবেন। আপনারা একটু সাবধান থাকবেন, কোন খারাপ খবর ওঁকে দেবেন না। যাতে ওঁর মন খারাপ হয়, এমন কিছুই করবেন না।

না, তা আমরা করব না। তোমাকে আর বার বার কি বলব, মা? যতদিন ও হাসপাতালে আছে, কখনো কাছ-ছাড়া হয়ো না যেন।

নিশ্চয়ই না। আমি খুব কাছে কাছেই থাকব।

অরুণা সর্বদা খুব কাছে কাছেই থাকে। মহিমের মন যাতে ভাল থাকে, সে চেষ্টা করে। আর কেউ এসে ওকে বিরক্ত না করে, বেশী কথা না বলে, কোন রকম উত্তেজনা না হয়, এ সবের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে।

মহিম একদিন বলিল, আপনার জন্যই এ যাত্রা আমি রক্ষা পেলাম।

কি যে বলেন! আপনার আঘাত তেমন গুরুতর ছিল না, আপনিই সেরে উঠেছেন।

সত্যি, আপনি এমন সেবা করতে পারেন!

আমাকে বার বার আপনি বলছেন কেন? আমি আপনার চেয়ে কত ছোট।

সত্যি বলছি, আমার হাসপাতাল ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না।

কি যে বলেন!

সত্যি বলছি।

তাহলে থাকুন চিরকাল এই হাসপাতালে।

সে তো আর সত্যি সত্যি হয় না।

এমনি ধরণের কথা মাঝে মাঝে হয় মহিম এবং অরুণার মধ্যে। কয়েকদিন পরেই তাহারা বুঝিতে পারিল তাহাদের অন্তরের প্রকৃত আকুলতা।

মহিম যখন অনেকটা ভাল হইয়াছে, ডাক্তারেরা বলিলেন, এখন বাড়ী যাইতে পারে, তবে মনে যেন কোন উত্তেজনা না হয়, বা কোন উদ্বেগ বা অশান্তি যেন না হয়। অন্ততঃ এক বৎসর খুব সাবধানে থাকিতে হইবে।

যেদিন হাসপাতাল ছাড়িয়া যাইবার কথা, তাহার পূর্বদিন রাত্রে একটা কাণ্ড হইয়া গেল। একটি মালা কিনিয়া আনিয়া অরুণা মহিমের গলায় পরাইয়া দিয়া তাহার পদধূলি লইল।

পরদিন মহিম তাহার মনের কথা আত্মীয়-স্বজনের কাছে বলিতেই তাহারা চটিয়া অগ্নিশর্মা হইলেন, ছুটিয়া গিয়া হাসপাতালের কর্তৃপক্ষকে জানাইলেন। তাঁহারাও ভীষণ চটিলেন। বলিলেন, আজই উহাকে হাসপাতাল হইতে বহিষ্কার করিয়া দিতেছি। নার্সের কাজ রোগীর শুশ্রূষা করা, রোগীর স্ত্রী হওয়া তার কাজ নয়।

মহিম বাড়ী ফিরিয়া গিয়া আহার নিদ্রা প্রায় ত্যাগ করিল। আত্মীয়-স্বজনেরা ভীষণ চটিলেন। মহিমের মা বলিলেন, এমন একটা অসুখের পর এখন মনের অশান্তি হওয়াটা কি ভাল! ডাক্তারেরা বলেছেন, ওর মনটা যেন কখনো উদ্বিগ্ন না হয়। আবার শক পেলে বাঁচানো মুশকিল হবে।

সন্তানের মঙ্গলকামনায় মাতা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন।

মহিমের মনের উদ্বেগ অপসারিত হইল। হাসপাতালের ক্যাবিনে যে মালা গলায় পরিয়াছিল, তাহা তাহার জীবনে অক্ষয় হইয়া রহিল।

মহিমের মাতা অরুণার চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া বলিলেন, আশীর্বাদ করি, তোমরা চিরদিন সুখে থাক।

অগাষ্ট, ১৯৫২

খুকীর ঝিনুক

খুকীর ঝিনুক হারাইয়াছে।

খুকীর ভাতের সময়ে খুকীর ন'-মাসিমা আদর করিয়া উহাকে এই ঝিনুকটি উপহার দিয়াছিলেন, কাজেই ঝিনুকটি বাড়ীর সকলের কাছেই খুব আদরের জিনিস। খুকীর মা রেবা সমস্ত বাড়ী তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াছে। খুকীর বাবা রমেশ ড্রয়ার আলমারির পিছন, খাটের তলা প্রভৃতি সম্ভব ও অসম্ভব সমস্ত স্থান খুঁজিয়া দেখিয়াছে কিন্তু ঝিনুকের সন্ধান মিলিতেছে না। যদি কাকে মুখে করিয়া কোথাও ফেলিযা থাকে এই সন্দেহে উঠান, ছাদ, পাঁচিলের এপাশ-ওপাশ সব খোঁজা হইয়াছে। শোবার ঘর, খাবার ঘর, রান্না ঘর, কলতলা প্রভৃতি কোন স্থানই বাদ যায় নাই। প্রত্যেকটি ঘর, প্রত্যেকটি কোণ, প্রত্যেকটি শেলফ্ অতি সাবধানে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখা হইয়াছে। কি আশ্চর্য! ঝিনুকটা গেল কোথায়? বাজার হইতে কিনিয়া আনিয়া কিংবা স্যাকরাকে দিয়া গড়ান ঝিনুকটা যদি হইত তবু একটা কথা ছিল, কিন্তু এটি যে ন'-মাসিমার কত আদরের দান। এই ঝিনুকটি গেল হারাইয়া! এত সহজে নিরস্ত হইলে চলিবে না। আরো ভাল করিয়া সন্ধান করিতে হইবে।

বাড়ীর প্রত্যেকটি লোককে ডাকিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জেরা করা হইল। তাহারা প্রত্যেকে কে কখন কোথায় ছিল, কে কখন কোথায় গিয়াছে, কে কখন কাহার সহিত কথা বলিয়াছে, কে কখন বাহিরে গিয়াছে, কে কখন বাড়ীতে আসিয়াছে, কে কখন কোন ঘরে ছিল, কে কখন কোন ঘর হইতে কোন ঘরে গিয়াছে, এবং কেন গিয়াছে, কে কোন ঘরে কতক্ষণ ছিল, কি জন্য ছিল, কি কাজের জন্য ছিল, বাহিরের কেহ বাড়ীতে আসিয়াছে কি না, গোয়ালা, ঝাড়ুদার, ঠিকা-ঝি প্রভৃতি কে কখন আসিয়াছে, কে কখন গিয়াছে, তাহারা কে কতক্ষণ কোন ঘরে ছিল প্রভৃতি বহু যত্ন সহকারে খুঁজিয়া দেখা হইল। কোনই সন্ধান পাওয়া গেল না।

সমস্ত দিন অতি সাবধানে লক্ষ্য রাখা হইল ঝি চাকর, বা বাহিরের অন্য কেহ কোন প্রকার সন্দেহজনক কথা বলে কি না, কোন প্রকার ফিসফিস করে কি না, বা কাহারও মুখে কোন অপরাধীর মত হাব ভাব লক্ষিত হয় কি না। কাহাকেও উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখা যায় কি না, কাহারও মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে কি না, প্রভৃতি বিষয়ে অতি সতর্কতার সহিত দৃষ্টি রাখা হইল।

রেবা বলিল, ও আর পাওয়া যাবে না। কেন আর ও নিয়ে এত হুলুস্থূল ?

রমেশ বলিল, নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। চুরি অমনি করলেই হোল।

অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। বহু সন্ধান, বহু গবেষণা, বহু বিশ্লেষণ ও বহু প্রতীক্ষার পর রেবা ও রমেশের ধারণা হইল, এ ঝিনুক চুরি করিয়াছে মালতী, ঠিকা-ঝি সৌদামিনীর দশ বছরের মেয়ে। সে মাঝে মাঝে আসে তার মায়ের সঙ্গে, কখন কখন তার মায়ের কাজে সাহায্য করে, কখনও বা রেবাকে সাহায্য করে এটা ওটা করিয়া দিয়া। রেবাও তাকে মাঝে মাঝে কিছু খাইতে দেয়। কখনও বা দুই চারিটি পয়সাও দেয়। এই মেয়েটিই কি না শেষে ঝিনুক চুরি করিল! তা এমন আশ্চর্য হবারই বা কি আছে। যে সংসর্গে প্রতিপালিত এবং যে অবস্থায় জীবন যাপন করে এরা, তাতে একটু লোভ হওয়া এমনই কি বিচিত্র ব্যাপার! কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। চুরি, চুরিই। ইহার সমুচিত ব্যবস্থা করিতে হইবে। নতুবা বাড়ীর মঙ্গল নাই, সমাজের মঙ্গল নাই।

সন্দেহ পাকা হইতেই মালতীকে ডাকা হইল। মালতীর মাকেও ডাকা হইল। তাহারা কিছুতেই স্বীকার করিল না। বেশ বুঝা গেল তাহারা দুজনাই বেশ ভয় পাইয়াছে। এদিকে পুলিশেও খবর দেওয়া হইয়াছে। কখন হয়তো তাহারা আসিয়া পড়িবে। সৌদামিনী ও মালতীর ভয়ার্ত ও উদ্বিগ্ন মুখশ্রী দেখিয়া রেবা বলিল, দেখ বোঝাই তো গেল ওরাই নিয়েছে আর ও নিয়ে হৈ চৈ করো না। পুলিশ এলে ওদের নিয়ে গিয়ে ওদের 'পরে জুলুম করবে।

তা করুক। একটু শিক্ষা হওয়া দরকার। সমাজের এই সব দুর্নীতি কখনই অবহেলা করা উচিত নয়। কবি বলেছেন, অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে— মনে আছে তো ?

তাই বলে ওই দুধের মেয়েটাকে—

কি যে বল। চুরি মানে চুরি। তা সে মেয়েই হোক আর ছেলেই হোক। ওর উপযুক্ত শাস্তি ওকে পেতে হবে।

রেবার চোখ দুইটি ছলছল করিয়া উঠিল।

পুলিশ আসিল। উহাদিগকে ধরিয়া উহাদের বাড়ীতে গেল এবং সৌদামিনীর একটি ছেঁড়া তালি-দেওয়া ময়লা বালিশের তলা হইতে ঝিনুকটি বাহির করিয়া ছোট দারোগাবাবু উহাদিগকে থানায় লইয়া গেলেন।

কেস হইল। জুভেনাইল অপরাধী হিসাবে একটা লঘু শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া হাকিম বলিলেন, মেয়েটাকে একটু ধমকে ছেড়ে দিলেই হতো। ভয়ে

যে শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে! গরীবের মেয়ে, অতটুকু লোভ এমন কি গুরুতর অপরাধ?

ছোট দারোগাবাবু উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, আমারও বিশেষ ইচ্ছা ছিল না। ওর মা অনেকদিন আমার বাসায়ও কাজ করেছিল। কোনদিন এতটুকু কোন জিনিস ছোঁয়নি। কিন্তু এজাহার পেলে আর মালসমেত আসামী পেলে আমিই বা কি করতে পারি?

২

পনর বছর পরে। লাহোরের লছমনঝোলা ব্যাঙ্ক লিমিটেড হঠাৎ ফেল করিয়াছে। ব্যাঙ্কের সামনে অসংখ্য লোক জড় হইয়াছে তাহাদের জমা টাকা উঠাইয়া লইবার জন্য। জনতা নিয়ন্ত্রিত ও হাঙ্গামা নিরস্ত করিবার জন্য পুলিশ আসিযাছে। শহরে হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। কত ধনী, কত গৃহস্থ, কত জমিদার, কত ব্যবসায়ী উদ্বিগ্ন মনে এই ভিড়ের মধ্যে পথ করিয়া লইযা ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সকলের মুখেই একটা আতঙ্কের ছাযা। যাহারা বিশ্বাস করিয়া নিজেদের সমস্ত সঞ্চিত ধন এখানে রাখিয়াছিল তাহাদের অবস্থাই সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক। এই ব্যাঙ্ক ফেলের ফলে হয়তো তাহাদের পথের ভিখারী হইতে হইবে। কত নিঃসন্তান বিধবা হয়তো তাহাদের সর্বস্ব এই ব্যাঙ্কে জমা রাখিযা তাহারই সুদের উপর নির্ভর করিযা দিনপাত করিতেছিল। এই বিপর্যয়ে তাঁহাদের শেষ সম্বলটুকু হারাইযা ভিখারিণীর বেশে সমাজের সামনে দাঁড়াইতে হইবে।

এই ভিড়ের মধ্য হইতে একটি ভদ্রলোক, পরণে বাঙালী পোশাক, হাতে একটি ছোট স্যুটকেশ, ক্রমশ বাহির হইয়া আসিয়া রাস্তায় নামিলেন। সকলেই ঘিরিযা ধরিল, ব্যাপার কি মশায়? কিছু আশা টাশা আছে?

আশা একটু আছে বই কি! ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন। ম্যানেজার হিসাব-পত্র দেখছেন। হয়তো সবাই কিছু কিছু পাবেন।

সকলেই ধৈর্য ধরিয়া রহিলেন। যুবকটি সোজা স্টেশনে আসিয়া কলিকাতার টিকিট কিনিয়া গাড়ীর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন? গাড়ী পৌঁছিবামাত্র ভীষণ ভিড়ের মধ্যে একটি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলেন।

বছর দুই এর মধ্যেই সাদার্ণ এভিনিউএ একখানি নূতন বাড়ী উঠিল। লাহোর

লছমনঝোলা ব্যাঙ্কের অ্যাসিস্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত রাধাশ্যামবাবু এ বাড়ীর মালিক। ব্যাঙ্কের ফেল করার সঙ্গে এ বাড়ীর ভিত্তি পত্তনের সম্বন্ধ বিষয়ে কাহারও মনে কোন সন্দেহ না থাকিলেও কিছুদিনের মধ্যেই অতিথি অভ্যাগতের কলগুঞ্জনে বাড়ীখানি মুখরিত হইয়া উঠিল।

৩

খুকী বড় হইয়াছে। উহার বিবাহের জন্য রেবা ও রমেশ উদ্বিগ্ন হইয়াছে। অনেক সম্বন্ধ আসিতেছে, যাইতেছে কিন্তু কোন কথা তেমন অগ্রসর হইতেছে না। রাধাশ্যাম এখনও অবিবাহিত, তাহারও বিবাহের ইচ্ছা হইয়াছে। তাহারও সম্বন্ধ আসিতেছে যাইতেছে অথচ পাকাপাকি ঠিক হইতেছে না। রমেশ বলিল, রাধাশ্যাম এমন মন্দ পাত্র কি? দেখব চেষ্টা করে।

রেবা বলিল, বয়সটা একটু বেশি, নয়? বোধ হয় উনত্রিশ ত্রিশ হবে। তাছাড়া লেখাপড়াও তো তেমন—

লেখাপড়া বেশি না জানলেও, মূর্খ তো নয়। আই-এ পর্যন্ত তো পড়েছিল। এমন অবস্থা, এমন বাড়ী ঘর, এসবও তো দেখতে হয়।

কিন্তু কেমন করে এসব হোল তাতো জান। এ টাকায় এ বাড়ী-ঘরে ওরা সুখী হবে মনে করো?

কি যে ছেলেমানুষের মত কথা বল তার ঠিক নেই। চুরি করলেই যদি লোকে অসুখী হোত তা হলে পৃথিবীতে চুরি বলে কিছু থাকতো না? ওসব বাজে কথা রেখে দাও।

যা ভাল বোঝ। আমি আর কি বলব।

সম্বন্ধ ঠিক হইয়া গেল। মহাসমারোহে বিবাহ হইয়া গেল।

খুকী আর খুকী নয়। সে এখন সুমিত্রা। সুমিত্রা শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছে। সুমিত্রার সঙ্গে আসিয়াছে মালতী। ঝিনুক চুরির পর সৌদামিনীকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু কিছুদিন ঝির অভাবে বহু প্রকার কষ্ট ও লাঞ্ছনা ভোগ করিবার পর একটু দয়া করিয়া তাহাকে পুনরায় নিযুক্ত করা হয়। ঝি চাকরদের আবার মান অভিমান কি? সৌদামিনীও পুরানো মালিকের কথা ঠেলিয়া ফেলিতে পারে নাই। তদবধি উহারা পূর্ববৎ রেবা ও রমেশের কাজ করিয়া আসিতেছে। বিবাহের সময়েও মায়ে ঝিয়ে দশটা চাকরের কাজ দুজনে করিয়াছে। রেবা ও রমেশ উভয়েই

মালতীকে নূতন শাড়ী জামা বখশিশ দিয়া আরো বখশিশের লোভ দিয়া সুমিত্রার সঙ্গে পাঠাইয়া দিয়াছে। এখানে আসিয়া সে সর্বদা সুমিত্রার সঙ্গে ঘুরঘুর করে। তার সব কাজ করিয়া দেয়, তার যাহাতে কখনো মন খারাপ না হয়, সে চেষ্টা করে।

গোলমাল মিটিয়া গিয়াছে। অতিথি-অভ্যাগতেরা প্রায় সকলেই বিদায় লইয়াছেন। একদিন বৈকালে সাদার্ণ এভেনিউএর দিক মুখ করিয়া সুমিত্রা ও রাধাশ্যাম বসিয়া আছে, কাছে একটি খেলনার বাক্স। সুমিত্রা ছেলেমানুষের মতো খেলনার বাক্স হইতে একটি একটি খেলনা বাহির করিতেছে। আর তাই লইয়া উভয়ে হাসাহাসি করিতেছে। খেলনাগুলির মধ্য হইতে হঠাৎ বাহির হইয়া পড়িল একটি ঝিনুক। ঝিনুকটি হাতে লইয়া সুমিত্রা বলিল, এই যে ঝিনুকটি দেখছ, এটা আমার ছেলেবেলাকার জিনিস। আমার ভাতের সময় আমার ন'-মাসিমা আমাকে দিয়েছিলেন। ওই মালতীটা এই ঝিনুক চুরি করে হাজতে গিয়েছিল।

ঘনশ্যাম যেন চম্‌কাইয়া উঠিল। বলিল, তাই নাকি! অমন চোর—তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে এ বাড়ীতে। ওকে এক্ষুণি বিদায় করে দাও। কত দামী দামী নানা রকম জিনিস রয়েছে, কখন কি চুরি করবে তার ঠিক নেই।

না, ও আর এখন চুরি করে না। ও আর ওর মা আমাদের বাড়ীতে অনেকদিন আছে।

না, না, বিশ্বাস নেই। এ বাড়ীতে চোর-টোর আমি কক্ষনো থাকতে দেব না।

পরদিন প্রাতে মালতীকে সুমিত্রার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। সুমিত্রা ছলছল চোখে বারান্দার রেলিং ধরিয়া মালতীর যাত্রাপথের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫

চেনা-চেনা

সন্ধ্যার পর। ফারপোর একতলা। ডানদিকের পাশের দিকে একখানি টেবিলে বসিয়া শ্রী এ. ব্যানার্জি, তরুণ ব্যারিস্টার। সামনে টেবিলের উপর স্যুপের প্লেট। দুই চামচে স্যুপ মুখে তুলিয়াছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, তাঁহার সামনে একটু দূরে একটি মহিলা আসিয়া বসিলেন। বেশ ছিমছাম বেশ, গালে পাউডার, ঠোঁটে রং, হাতে রিস্টওয়াচ, গলায় মুক্তার মালা। ছোট লাল টকটকে ব্যাগটি টেবিলে নামাইয়া রাখিয়া এদিক ওদিক একটু চাহিতে লাগিলেন। অমলবাবুও চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। অমলবাবুর মনে হইল, মহিলাটি তাঁহার দিকে বারবার তাকাইতেছেন। মহিলাটিরও মনে হইল অমলবাবু তাঁহার দিকেই চাহিয়া আছেন। অনেকবার দৃষ্টি বিনিময় হইল। দুই একবার এমনও মনে হইল, মহিলাটির ঠোঁটে যেন সামান্য একটু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়া আবার মিলাইয়া গেল!

বয় আসিয়া যখন স্যুপের প্লেট লইয়া গেল, তখন অমল বলিলেন, ওই মেম সাহেবকে জিজ্ঞাসা কর, উনি এই টেবিলে এসে বসবেন? বলো, আমি জিজ্ঞেস করেছি।

বয় যথাস্থানে সংবাদ দিতেই মহিলাটি ধীরে ধীরে উঠিলেন এবং ব্যাগটিকে ঝুলাইতে ঝুলাইতে অমলের টেবিলে আসিয়া বসিলেন। অমল সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিলেন এবং বলিলেন, কিছু মনে করবেন না, আমার যেন মনে হচ্ছিল, আপনাকে কোথায় দেখেছি।

তা দেখতে পারেন, কলকাতায়ই থাকি যখন।

তা বেশ! প্রায়ই বুঝি আসেন এখানে?

না, প্রায়ই নয়। তবে কখনো সখনো একটু মুখ বদলাতে ইচ্ছে করে।

আচ্ছা, আমার স্যুপ খাওয়া হয়ে গেছে। আমি একটু বসি। আপনি স্যুপটা খেয়ে নিন।

বয় স্যুপ দিয়া গেল। মহিলাটি স্যুপ খাইতে লাগিলেন। অমল মুগ্ধনেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল।

স্যুপ শেষ হইলে মাছ ভাজা আসিল। অমল বলিল, মাছভাজা খেতে আমার বেশ ভাল লাগে

আমারও।

আর একখানা করে অর্ডার দেব ?

আপত্তি নেই।

আবার মাছভাজা আসিল।

এমনি করিয়া গল্প করিতে করিতে উঁহারা আহার করিতে লাগিলেন। কলকাতার কথা, দেশ-বিদেশের কথা, এরোপ্লেনের কথা, মাউণ্ট এভারেস্টের কথা, ফুটবলের কথা, এমনি কত কথা হইল। হু একটা সিনেমার কথাও বাদ গেল না। শুধু বাদ গেল, আত্মীয়-স্বজনের কথা।

কফির বাটিতে চুমুক দিতে দিতে অমল বলিল, আজ সন্ধ্যেটা বেশ কাটল।

হ্যাঁ। আমারও।

সত্যি। আমার যেন আর টেবিল ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না।

তা, আপনি বসে থাকুন। আমাকে কিন্তু উঠতে হবে।

আমিই কি আর বসে থাকব না কি ? আচ্ছা, আপনার সঙ্গে এতক্ষণ এত আলাপ হ'ল, কই আপনাকে কি বলে ডাকব, তা তো বললেন না।

আমাকে ডাকতেই হবে ? নাই বা ডাকলেন।

তা কি হয় !

তাহলে অমিয়া বলবেন।

আচ্ছা, মিস অমিয়া, আর কিছু খাবেন ?

না। অনেক খাওয়া হয়েছে।

বয় বিল লইয়া আসিল। হু'খানা বিল। হু'খানাই অমল হাতে লইয়া বলিল, আচ্ছা, দামটা আমি দিয়ে দি ? আমি আজকের হোস্ট।

আপনি যদি বলেন, আমি আপত্তি করব না।

বিল চুকাইয়া দিয়া তাঁহারা হুজনেই উঠিলেন। বাহিরে আসিয়া অমিয়া একটু তাড়াতাড়িই অমলকে একটা নমস্কার করিয়া ডানদিকে চলিয়া গেলেন। অমলও সেইদিকে একটু চাহিয়া থাকিয়া নিজের গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন।

২

মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ম্যাচ। সমগ্র কলিকাতা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে গড়ের মাঠে। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল মাঠের গ্যালারীতে, বাহিরে, ফোর্টের

পাশের ঢালুতে লোকে লোকারণ্য। অসংখ্য গাড়ী একত্র হইয়াছে। অসংখ্য পেরিস্কোপ মাথা উঁচু করিয়া আছে।

মোহনবাগানের গ্যালারী এবং ইস্টবেঙ্গলের গ্যালারীর মাঝখানে একটি পথ। এই পথের পাশে একেবারে একধারে বসিয়া আছেন অমল ব্যানার্জি। একাগ্র মনে খেলা দেখিতেছেন। মুখে মাঝে মাঝে বলিয়া উঠিতেছেন, ইস্, আহাহা, আর একটু, ঐ-যা, আরো কত কি। মনে মনে ভাবিতেছেন, ওই সটটা যদি একটু নিচে দিয়ে যেত, ওই বলটা যদি মিস না করত, হাফব্যাকটা যদি পা পিছলে পড়ে না যেত, ইত্যাদি। মোট কথা, তাঁহার সমস্ত শরীর, মন একান্তভাবে খেলার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। মনে মনে তিনিও যেন খেলিতেছেন।

এমনি করিয়া খেলা দেখিতে দেখিতে হাফ-টাইম আসিল। খেলোযাড়রা একটু বিশ্রাম লইল। অমলবাবুরাও একটু বিশ্রাম লইলেন। কিন্তু সে বিশ্রাম শুধু শারীরিক। মৌখিক পরিশ্রম দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। পাশের দর্শকদের সঙ্গে সে কি তুমুল তর্ক! ও ফাউলটা রেফারি কেন ধরল না, শুধু শুধু কেন অফ-সাইড দিল, নিশ্চযই ব্যাটা ঘুষ খেয়েছে, ওকে ধরে মার লাগান উচিত, ওকে আমি খুন করব, হাতে বন্দুক থাকলে এখনই গুলী করতুম, ওকে এখুনি ঘাড় ধরে বের করে দেওযা হোক ইত্যাদি।

গ্যালারীর পাশে যে পথ, সেই পথের ওপাশে সহসা লক্ষ্য করিতেই অমল দেখিতে পাইলেন, একটি মহিলা তাঁহার দিকে চাহিয়া মিট মিট করিয়া হাসিতেছেন। নিজের উত্তেজনায যেন লজ্জায মরিয়া গেলেন। তথাপি বেশ একটু ‍ ‍তিভভাবেই বলিলেন, ওঃ আপনি এখানে? প্রাযই আসেন বুঝি?

না, প্রাযই নয। তবে কখনো সখনো আসি, ভাল ম্যাচ থাকলে।

তা বেশ। খেলা কেমন দেখছেন?

বেশ দেখছি।

অমিয়ার পাযে লাল স্যাণ্ডাল, পরনে লালপাড়ের কাপড়, লাল রংএর ব্লাউজ, হাতে লাল রংএর ব্যাগ, নখে লাল রং, ঠোঁটে লাল রং, ছোট বেঁটে ছাতাটিও লাল টকটকে। সব মিলিয়া তাঁহাকে অপরূপ দেখাইতেছে। অমল একটু চাহিয়া রহিলেন। পরক্ষণে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা, আপনি ওই গোলটা লক্ষ্য করেছেন? কি চমৎকার গোল!

না। ঠিক সেই সময়ে আমি ব্যাগটা খুলে আয়নার সামনে নাকের ডগায় একটু পাউডার বুলোচ্ছিলুম। হঠাৎ শুনি ভীষণ হাততালির শব্দ! পাশের মহিলাটিকে

জিজ্ঞেস করে জানলুম, ওদিকে একটা গোল হয়েছে, তাই সবাই হাততালি দিচ্ছে। পাশের মহিলাটিও ছাতা হাতে করে লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন। আমি ধরে বসিয়ে দিলুম।

ইস্, আপনি কি জিনিস যে মিস করলেন, তা আপনি জানেন না। কি বিউটিফুল গোল। গোল তো নয়, একখানা ছবি! বছরে অমন একটা গোল হয় না। ইস্, কি জিনিসই আপনি মিস্ করলেন!

আচ্ছা, ওই তো আবার খেলা আরম্ভ হল। এবার খুব মনোযোগ দিয়ে দেখব। তবে আপনি অতটা উত্তেজিত হবেন না। বসেছেন গ্যালারীর একেবারে পাশে। হঠাৎ নিচে পড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙ্গবেন না যেন!

অমলকে উপদেশ দেওয়া প্রয়োজন ছিল না। অমিযাকে দেখার পর হইতে তাহার মনের উল্লাস ও উত্তেজনা খেলা ও অমিযার মধ্যে বিভক্ত হইয়া স্বতই মন্দগতি হইয়া গিয়াছে। অমিয়াও আর মুখে পাউডার মাখিতেছেন না। তবে মাঝে মাঝে অমলের দিকে চাহিযা দেখিতেছেন, অমলের চোখ কোনদিকে।

খেলা শেষ হইলে উঁহারা এক সঙ্গেই বাহির হইলেন। মাঠ ছাড়িয়া রাস্তায় আসিলেন। অমল বলিলেন, চলুন আমার গাড়ীতে। কোথায় যাবেন আপনি?

আমাকে ধর্মতলার মোড়ে নামিযে দিলেই হবে।

অমল ও অমিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। ড্রাইভার গাড়ীতে স্টার্ট দিল।

অমল বলিলেন, সত্যি আমার কেবলই মনে হচ্ছে, আপনাকে কোথায় দেখেছি।

হ্যাঁ, ফারপোতে দেখেছেন। আমাকে ডিনার খাইয়েছেন।

উঁহু। তারও অনেক আগে যেন দেখেছি। কিছুতেই মনে করতে পারছিনে।

আগের কথা নাই বা মনে থাকল। কি আসে যায় তাতে?

তা বটে, তা বটে, আচ্ছা, চলুন না, কোথায়ও একটু চা-টা—

না। আজ থাক। আর একদিন হবে।

আর একদিন? সে কোন্ দিন?

তা জানিনে। দেখা হবেই কখনো না কখনো।

না হতেও পারে।

হ্যাঁ, তা পারে।

তা'হলে?

তা হলে এক সঙ্গে চা-খাওয়া হবে না।

সুতরাং আজই একটু—

বেশ। কোথায় যাবেন, বলুন।

ড্রাইভারকে একটি রেস্তোঁরার কথা বলিয়া দেওয়া হইল।

রেস্তোঁরায় বসিয়া চা-খাওয়ার সময়ে বহু গল্প হইল। তাহার মধ্যে ফুটবলের গল্পই বেশি। রেস্তোঁরা হইতে বাহির হইয়া অমিয়া আর গাড়ীর দিকে গেল না। তাড়াতাড়ি একটা নমস্কার সারিয়া চৌরঙ্গীর ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেল।

অমল গাড়ীতে গিয়া উঠিল। অমিয়া সম্বন্ধে নানা কথা তাহার মনে হইতে লাগিল। রোজই বোধ হয় ওই মহিলাটি এমনি করিয়া চা ও ডিনার খান। পরক্ষণেই তার মনে পড়িয়া গেল সেই অফ-সাইডটার কথা। ও! কি ভয়ানক! অমন লোককে কখনই আর রেফারীগিরি করতে দেওয়া উচিত নয়। ও কি না পারে? মানুষ খুন করতে পারে।

ইস্টার্ণ পার্কে প্রদর্শনী।

চারিদিকে উঁচু টিনের পাঁচিল। তার উপরে আলোর মালা। গেটে বহু বর্ণের অসংখ্য আলো ঝলমল করিতেছে। ভিতরে ঢুকিলেই দেখা যায় আলোর কি বিচিত্র সজ্জা। প্রদর্শনীর মধ্যে যে কয়টি গাছ ছিল, সমস্ত গাছগুলিতেই নানা বর্ণের আলো ঝিকমিক করিতেছে। প্রদর্শনীর মধ্যে লম্বা লম্বা পথ। পথের দু'পাশে অসংখ্য দোকান বা স্টল। কত প্রকার দ্রব্যসম্ভার সাজানো রহিয়াছে, তার ইয়ত্তা নাই। জামা, কাপড়, বাসনপত্র, কাঠের জিনিস, এনামেলের জিনিস, কাচের জিনিস, খেলনার জিনিস, আচার চাটনি-পাঁপর, সাবান, তেল, এসেন্স, ছুরি, কাঁচি, দা, বঁটি, আরো কত কি! প্রত্যেকটি দোকান নানা প্রকার আলোয় ঝলমল করিতেছে।

অগণিত দর্শক ও দর্শিকা। বালক, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, কেহই বাদ নাই। কিশোরী, যুবতী, প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা সকলেই আসিয়াছেন। কেহ একা, কেহ স্বামী-স্ত্রী, কেহ সপরিবারে, কেহ সবান্ধবে আসিয়াছেন। এক এক স্থানে বেশ ভিড় হইতেছে। মাঝে মাঝে পরিচিত-পরিচিতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়া গেলে মিষ্ট হাসি, মিষ্ট আলাপের বিনিময় হইতেছে। "এই যে তোমরাও এসেছ দেখছি," "আর বলেন কেন, ছেলেমেয়েগুলো কি ছাড়ে?" ইত্যাদি কথা শোনা যায়।

শ্রীঅমল ব্যানার্জি একখানি ছড়ি হাতে করিয়া প্রদর্শনীতে ঢুকিয়াছেন। ঘুরিয়া

ঘুরিয়া দোকানগুলি দেখিতেছেন। সহসা দেখিলেন, একটু দূর হইতে একটি মহিলা তাঁহারই দিকে আসিতেছেন।

এই যে, নমস্কার।

নমস্কার! কখন এলেন?

অল্পক্ষণ।

অমল বলিলেন, অনেকক্ষণ ঘুরেছেন। কি আর দেখবেন। সব প্রদর্শনীতেই তো এই সবই দেখছেন। চলুন, একটু বিশ্রাম করা যাক।

এখানে আর কোথায় বিশ্রাম করবেন?

চলুন না ওই স্টলটায়, একটু চা-টা—

বেশ চলুন।

অমল মনে মনে ভাবিল, আজও দেখছি আমিই জালে পড়েছি। ওঁর চা-খাওয়াটা আজ আমার উপর দিয়েই হবে। অথচ আমিই সব জেনে শুনেই তো নিমন্ত্রণ করলাম। অমলের চিন্তা শেষ হইবার পূর্বেই তাঁহারা চায়ের স্টলে একটি টেবিলে বসিয়া পড়িয়াছেন। একখানি কেকের টুকরায় কামড় দিতে দিতে অমিয়া বলিলেন, এতদিন পরে আমার মনে পড়েছে।

কি মনে পড়েছে?

কোথায় আপনাকে প্রথম দেখেছিলাম।

কোথায়, বলুন তো?

আপনার বাসরঘরে। বছর তিনেক আগে।

অমল চমকাইয়া উঠিল। তাহার মুখখানা যেন বিবর্ণ হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে চার-পাঁচটি যুবক ও যুবতী হাসিতে হাসিতে এক সঙ্গে স্টলে ঢুকিয়া তাহাদেরই পাশের একখানি টেবিলে বসিয়া পড়িল এবং অমলের মনে হইল, তাহারা সকলেই তাহারই দিকে বার বার চাহিতেছে।

অমিয়া বলিলেন, এখন মনে পড়েছে আমাকে? ওই যে মেয়েটি গেয়েছিল—ওহে সুন্দর, মম গৃহে আজি পরমোৎসব রাতি—

অমলের মুখ-কান লাল হইয়া উঠিয়াছে।

অমিয়া বলিলেন, আপনার স্ত্রী নীলিমা আমার পিসতুত বোন। আজই সকালে তার চিঠি পেয়েছি—দেরাদুন থেকে লিখেছে—

অমল বয়কে ডাকিয়া বলিল, বিলটা নিয়ে এস।

অমিয়া বলিলেন, এই যে পাশের টেবিলে বসেছে, এরা সব আমার ভাই, বোন, দাদা, বৌদি। আসুন সবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি।

বেয়ারা বিল লইয়া আসিতেই, অমল বিলটি চুকাইয়া অমিযাকে বলিল, মাপ করবেন। আর একদিন হবে। আজ আমার একটা দরকারী কাজ আছে।

এই কথা বলিয়াই শ্রীঅমল ব্যানার্জি স্টল হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

জুলাই, ১৯৫৬

চতুষ্কোণ

মধ্য কলিকাতার একটি ছোট ফ্ল্যাটে থাকে হরিহর। দুইখানি ছোট ঘর, একফালি বারান্দা আর ছোট একটি রান্নাঘর। হরিহরের চাকরি সামান্য। কায়-ক্লেশে সংসার চলে। সংসারে আপাততঃ দুইটি প্রাণী, সে নিজে এবং তাহার নবপরিণীতা স্ত্রী। মাঝে মাঝে তাহার এক পিসিমা আসিয়া থাকেন দুই-চারিদিনের জন্য। স্থায়িভাবে আর কেহ বাস করে না।

হরিহরের স্ত্রী অলকা অসামান্যা রূপসী। যেমন গায়ের বর্ণ, তেমনি চোখ-মুখের অপূর্ব শ্রী। একখানি লক্ষ্মীপ্রতিমার মতই সে হরিহরের অনটনক্লিষ্ট গৃহস্থালীর মধ্যে বিরাজ করে। পাড়ার লোকে দেখিয়া মুগ্ধ হয়। যুবকেরা হরিহরকে হিংসা করে। বৃদ্ধেরা বলেন, আহা, এমন লক্ষ্মী মেয়ে, ভাল করে খেতে-পরতেও পায় না। রাজার ঘরে হলে একে মানাত। অলকা কিছুই গায়ে মাখে না। প্রাণপণে স্বামীকে সেবা করে, গৃহস্থালীর কাজকর্ম করে। হয়তো মাসের মধ্যে একদিন একটা সিনেমা দেখিয়া আসে, কোন মাসে তাও হয় না। এজন্য তাহার মনে ক্ষোভ নাই। স্বল্পপরিসর জীবনের মাঝে অবরুদ্ধ তাহার কল্পনা পরম তৃপ্তিতেই রঙীন স্বপ্ন দেখে।

দারিদ্র্যের নিপীড়ন হরিহরকে উদ্বিগ্ন করিয়া তোলে। কখনই স্বস্তি পায় না। অথচ দারিদ্র্য দূর করিবার কোন সম্ভাব্য উপায়ও আবিষ্কার করিতে পারে না। সকাল ও সন্ধ্যায় অনেক দিনই সে চিন্তাভারাক্রান্তচিত্তে বসিয়া থাকে। অলকাকে সম্মুখে দেখিলে তাহার চিন্তা ও উদ্বেগ আরও বাড়িয়া যায়। অলকা বলে, কেন অত ভাব? হরিহর বলে, আমার জন্য কি আর ভাবি? ভাবি তোমার জন্য। অলকা অভিমান করিয়া বলে, আমিই বুঝি তোমার এত অশান্তি, এত দুর্ভাবনার কারণ? হরিহর কথার মোড় ঘুরাইয়া বলে, আহা, কি যে বল। এত দুর্ভাবনার মধ্যেও তুমিই যে আমার একমাত্র সান্ত্বনা। অলকা বলে, আচ্ছা হয়েছে এই নাও, কয়েকখানা নিমকি ভেজেছি আজ। ধর একটু, এখুনি চা নিয়ে আসছি।

একদিন বৈকালে হরিহর একখানি কাগজের পাতা উল্টাইতেছে। সহসা তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল একটি বিজ্ঞাপন, 'সত্তর বৎসর বয়স্ক মরণাপন্ন বৃদ্ধের জন্য যে কোন জাতির রূপসী পাত্রী আবশ্যক। পাত্র অগাধ সম্পত্তির অধিকারী। অন্ততঃ ছয় লক্ষ

টাকার সম্পত্তি নূতন স্ত্রীর নামে উইল করিয়া দিবেন। বক্স নম্বর ইত্যাদি।'

বিজ্ঞাপনটি পড়িয়া হরিহর বেশ একটু চিন্তা করিতে আরম্ভ করিল। খানিকক্ষণ চিন্তা করিবার পর অলকাকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা তুমি নাকি ইস্কুলে আবৃত্তি, অভিনয় খুব ভাল করতে?

এখন আর সে কথা কেন?

একটু দরকারী কথা আছে।

আসছি। ভাতের ফেনটা গেলে রেখে আসি।

অলকা ফিরিয়া আসিল। হরিহর বলিল, একটু অভিনয় করতে পারবে?

অনেকদিন ওসব করিনি। তবে একটু অভ্যাস করে নিলে পারতে পারি। কেন, কোথায় কিসের অভিনয় করতে হবে?

বলছি শোন।

আসছি, ডালে একটু জল ঢেলে দিয়ে আসি। নইলে ধরে যাবে।

অলকা ফিরিয়া আসিল। হরিহর বলিল, কিছুদিন এক ভদ্রলোকের স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করিতে পারবে?

কোন নাটকে?

নাটক নয়। সত্যি সত্যি।

সে আবার কি?

হরিহর বিজ্ঞাপনটি অলকাকে দেখাইয়া তাহাকে বলিল, তুমি ওই বুড়োটাকে যদি বিয়ে কর, তাহলে কিছু দিনের মধ্যেই ছ'লাখ টাকার মালিক হবে। তখন আবার তুমি আমাকে বিয়ে করবে। আমাদের সমস্ত জীবন বদলে যাবে।

কি, যা তা বল। কি হবে ছ'লাখ টাকা দিয়ে। বেশি টাকা মানেই বেশি অশান্তি। বেশ তো আছি। কিছুদিন পরে, তোমার মাইনে আরো কিছু বেশি নিশ্চয়ই হবে। কেন ওসব লাখ টাখের দিকে নজর দিচ্ছ। তাছাড়া, তোমার স্ত্রী হয়ে আবার আর একজনকে বিয়ে করব, কি ঘেন্না! তুমি ওসব আজগুবি মতলব ছাড়। যাই দেখি, ডালটায় সম্বরা দিয়ে আসি।

অলকা ফিরিয়া আসিলে হরিহর বলিল, তুমি একটু ভেবে দেখ। দু'চার মাস একটু অভিনয় করবে। তারপর টাকাটা হস্তগত হলেই—

যদি আমি আর না ফিরি?

তা কি হয় অলকা? তুমি একান্ত আমারই যে।

তা যাই বল, মেয়েছেলে নিয়ে ওসব খেলা খেলতে নেই। যারা এসব খেলা খেলে, তারা অন্য ধাতের, অন্য জাতের মানুষ।

ওসব সেকেলেমি রাখ। ভাল করে ভেবে মন ঠিক করে ফেল। আমি বিজ্ঞাপনের উত্তর দিচ্ছি কিন্তু।

ধর যদি আমি রাজী হই, আর পাত্রপক্ষও রাজী হয়, তাহলে বিয়ের ব্যবস্থা কেমন করে হবে?

সেসব ডিটেলস আমি ঠিক করব। তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি একবার খুশী মনে মতটা দিয়ে ফেল।

অলকা বলিল, ভেবে দেখি।

২

অলকা ভাবিতেছে। তাই তো, এ আবার কি উড়ো বিপদ! ওঁর মনের যে ভাব দেখছি, তাতে উনি একরকম ঠিক করেই ফেলেছেন। কিন্তু ছিঃ ছিঃ। স্বামীকে রেখে আবার আর একজনের সঙ্গে বিয়ে হবে, ফুলশয্যা হবে, আর একজন বরের সঙ্গে ঘরকন্না করতে হবে। ছিঃ! কিন্তু যদি সবটাই একটা অভিনয় বলে মনে করে নেওয়া যায়? অভিনয়ে তো সবই হয়। বিয়ে হয়, ঘর-সংসার হয়, আবার তিন ঘণ্টা পরেই সব ফাঁকা। এও তেমনি কয়েকটা মাস একটু অভিনয়। তেমন ক্ষতিই বা কি! কিন্তু ছিঃ ছিঃ! আবার কেমন করে গাঁটছড়া বেঁধে বাসরঘরে গিয়ে উঠব? মনে মনে সবটাকে একটা অভিনয় মনে করে নিলেই হবে। কি আর করব? উনি যখন নাছোড়বান্দা।

অলকা ভাবিতেছে। একদিন, দুইদিন, তিনদিন। হরিহর ক্রমাগত বুঝাইতেছে। কয়েকটা মাস বই তো নয়? বিজ্ঞাপনে যখন লিখেছে, মরণাপন্ন, তখন কতদিন আর বাঁচবে? লক্ষ্মীটি, মন ঠিক করে ফেল। সব সময়েই মনে করবে থিয়েটারে অভিনয় করছ। তোমার কিছুই হয়নি। কিছুদিন পরেই আবার যখন তুমি আমার কাছে ফিরে আসবে, ছ'লাখ টাকার কোম্পানীর কাগজ সঙ্গে করে, ভেবে দেখ তো, তখন কি মজাটাই না হবে!

অলকা মুখ ভার করিয়া বলিল, অভিনয় দেখতে যেমন মজা, অভিনয় করাটা কিন্তু তেমন মজার নয়।

কদিনের ব্যাপার বই তো নয়। বড়লোকের বাড়ী। লোকজন, হৈ-হৈ, খাওয়া

দাওয়া, আদর আপ্যায়ন, এই সব নিয়ে তোমার দিনগুলো বেশ কেটে যাবে। নাও, আর ইতস্ততঃ ক'রো না। প্রস্তুত হয়ে থাক। এদিকে দেখি, আমার চিঠির জবাব আসে কি না।

কয়েকদিন পরে চিঠির জবাব সত্যই আসিল। পাত্রী দেখা এবং পরবর্তী আয়োজন সম্বন্ধে কথাবার্তা বলিবার জন্য হরিহর পাত্রের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। হরিহর পাত্রপক্ষকে বলিল, পাত্রী পরমা সুন্দরী। দেখিবামাত্র পছন্দ হইবে। তবে অতিশয় দরিদ্র। বাগবাজারে এক পিসির বাড়ীতে থাকে। দূরসম্পর্কে আমার শালী হয়। এরূপ বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহে মত করাইতে আমার অত্যন্ত বেগ পাইতে হইয়াছে। আত্মীয়স্বজন কাহারও মন নাই। সুতরাং একটু নীরবে ও সতর্কভাবে বিবাহকার্য সম্পন্ন করিতে হইবে। মেয়ে দেখাটা সন্তর্পণে সারিতে হইবে। পাকাদেখাও তাই। তারপর বিবাহ হইয়া গেলে আপনাদের নিজেদের বাড়ীতে আনিয়া আপনারা যত ইচ্ছা আমোদ-আহ্লাদ উৎসব করুন, তাতে আসিয়া যাইবে না।

কয়েকদিনের মধ্যেই অতি সন্তর্পণে মেয়ে দেখান হইল, বাগবাজারের একটি দূর-সম্পর্কীয়া আত্মীয়ের বাড়ীতে। এই আত্মীয়েরা হরিহরের বিবাহের সংবাদও জানিতেন না। হরিহর তাঁহাদিগকে বুঝাইয়াছে, অল্প সময়ের মধ্যে হঠাৎ আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল, কাউকেই জানাতে পারিনি। এখন আমার এক দূরসম্পর্কের অনাথা শালীকে নিয়ে পড়েছি মুশকিলে। কোন মতে পাত্রস্থ করতে পারলে বাঁচি। আমার কাউকে নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ করবার ক্ষমতা নেই। পাত্রপক্ষকে বুঝিয়ে বলেছি, তাঁরা দুই-একজনের বেশি লোক আনবেন না। তারপর তাঁরা ওঁকে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে যত ইচ্ছে আমোদ-আহ্লাদ করুন।

আত্মীয়টি বেশ একটু বিস্মিত হইলেও ব্যাপারটাকে একেবারে অভিনয় বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। বর্তমানের এই দুর্দিনে কত কাণ্ডই তো হইতেছে! একটি দরিদ্র তরুণীর বৃদ্ধের সহিত বিবাহ আর এমন বেশি কি সাংঘাতিক ব্যাপার। বাগবাজারের আত্মীয়টি তাঁহার বাড়ীতে বিবাহের উদ্যোগে কোন বাধা দিলেন না।

৩

বিবাহের দিন। বিশেষ কোন আয়োজন নাই। নেহাত যাহা না হইলে নয়, তাহাই করা হইতেছে। বাজনা বা আলোকসজ্জা কিছুই নাই। শুধু সামনের দরজার উপরে একটি পাঁচশত পাওয়ারের বাল্ব ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পাড়ার

দুই-একটি অনুসন্ধিৎসু ছোকরা ইতিমধ্যে খোঁজখবর লইয়া গিয়াছে। একটি অনাথার বিয়ে, কি আর এমন অসাধারণ ব্যাপার? ছোকরাদের কোনরূপ উৎসাহই নাই।

বৈকালের দিকে হরিহর পাত্রী লইয়া বাগবাজার যাত্রা করিবে। যাত্রার পূর্বে হরিহর ও অলকা উভয়েরই চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল। এক একবার মনে হইল হরিহরের সঙ্কল্প বুঝি শিথিল হইয়া যায়। অলকার বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল। সে বলিল, কাজটা কি ভাল হচ্ছে?

হরিহর ধরা গলায় বলিল, সবই তো ভেবেছি, অলকা। এখন আর শেষ মুহূর্তে ভেঙে প'ড় না। কটা মাস বই তো নয়। তার পরই আবার তুমি আর আমি—

থাক, সব বোঝা গেছে।

এই কথা বলিয়া অলকা হরিহরের বুকের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

হরিহর তাহাকে নানাপ্রকারে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। অবশেষে বলিল, দেখ কথা যখন দেওয়া হয়ে গেছে, পাকা দেখা হয়ে গেছে, এখন আর পিছিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

খানিকক্ষণ পরে খানিকটা অশ্রুবর্ষণ করিয়া অলকা একটু শান্ত হইল এবং বলিল, একটু অপেক্ষা কর, আসছি।

অলকা ঘরের ভিতর গিয়া একখানি প্লেটে দুইটি কড়াপাকের সন্দেশ আনিয়া হরিহরের সামনে ধরিল এবং বলিল, তুমি কড়াপাকের সন্দেশ এত ভালবাস, মাঝে মাঝে এনে একটু খেও। এখন তোমার খরচ কত কমে যাবে।

হরিহর ক্ষণেকের জন্য অভিভূত হইয়া পড়িল। তারপর একটু একটু করিয়া সন্দেশ খাইতে খাইতে বলিল, এই নাও, এইটুকু তুমি খাও।

থাক, আর আদরে কাজ নেই। খুব বোঝা গেছে।

আহা হা, কেন অত উতলা হচ্ছ, কটা মাস একটু ধৈর্যের সঙ্গে অভিনয়টা করে এস, তারপর—

আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে। নাও, চল, কোথা যাবে বল।

সন্দেশের রেকাবিটা ঘরে রাখিয়া অলকা বলিল, ঝিকে বল যেন মেজে রাখে।

একটি ছোট স্যুটকেশ গুছাইয়া লইয়া হরিহর ও অলকা বাহির হইল। রাস্তায় পা দিতেই পাশের ফ্ল্যাটের মুকুন্দবাবুর সঙ্গে দেখা। মুকুন্দবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কি, কোথায় যাওয়া হচ্ছে। তারকেশ্বর, না পুরী?

কোথাও না কাকাবাবু। ওঁর শরীরটা কিছুদিন থেকে ভাল নেই কি না।

এখানে আমার কি দুরবস্থা, তা তো স্বচক্ষেই দেখেছেন। তাই পাঠিয়ে দিচ্ছি কিছুদিন বাগবাজারে ওর এক দূরসম্পর্কীয়া পিসির কাছে। তাঁর অবস্থা খুব ভাল, ছেলেপুলে নেই। যত্নেই থাকবে। কয়েক মাস থাকুক সেখানে, কি বলেন?

তা বেশ। এ অবস্থায় একটু বিশ্রাম, একটু ভাল খাওয়া-দাওয়া দরকার বৈ কি। তা বেশ। সব ভালয় ভালয় হয়ে যাক, তারপর আমাদের মিষ্টান্ন, হেঃ হেঃ।

হরিহর ও অলকা আর বিলম্ব না করিয়া সোজা বাগবাজারে কমলবাবুর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। কমলবাবু অভ্যর্থনা করিলেন। কমলবাবুর স্ত্রী অসিতা ক'নেকে আদর করিয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া গেলেন। তাঁহার দুইটি মেয়ে লতিকা ও বাণী, একজন অলকার চেয়ে বড় আর একজন ছোট। লতিকার বিবাহ হইয়াছে। তাহারা অলকাকে কাছে টানিয়া লইয়া আদর করিল।

সন্ধ্যার সময়ে মেয়ে সাজান হইতেছে। বাণী ও লতিকার সঙ্গে পাড়ার দুই-একটি মেয়েও যোগ দিয়েছে। মেয়েকে সাজানর সময়ে পাড়ার একটি মেয়ে লতিকাকে একটু ইশারা করিয়া পাশের ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেল। বাণী এবং আর একটি মেয়ে তাহাকে সাজাইতে লাগিল। অসিতা এক একবার কাছে আসিয়া দেখিয়া যাইতে লাগিল।

পাড়ার মেয়েটি লতিকাকে ফিসফিস করিয়া বলিল, আমার কিন্তু কেমন কেমন ঠেকছে।

কি হ'ল?

মেয়েটার যেন স্বামী আছে বলে মনে হচ্ছে।

যাও, কি যে বল!

সিঁথির পাশে একটু লাল দাগ দেখেছি। সিঁদুর মুছে ফেললে যেমন হয়।

ও তুমি ভুল দেখেছ।

বাঁহাতের একটা আঙুলে আংটির দাগ রয়েছে—একেবারে স্পষ্ট।

তাই নাকি? তা শখ করে হয়তো আংটি পরত, এখন খুলে রেখেছে।

তুমি যাই বল, কিছু একটা বিশ্রী ব্যাপার আছে বলে আমার সন্দেহ হচ্ছে। তুমি ছেলেমানুষ বুঝতে পারছ না। ও নিশ্চয়ই কারো বউ।

যাই হোক গে, আমাদের সঙ্গে এই রাতটার সম্পর্ক। কোনরকমে কেটে গেলেই হল। ভদ্রলোক এসে বাবাকে ধরে বসলেন, কোন স্থান নেই, উপায় নেই, অনাথা মেয়ে, যদি একটা হিল্লে হয়। তুমি আমাকে যা বললে, আর কাউকে কিছু বল না যেন।

না, না। আমি কি পাগল নাকি? একটু পরেই বর এসে যাবে। এখন কোন গোলমাল করতে আছে?

উহারা কনের কাছে আসিয়া সাজানর কাজ শেষ করিল। মুখে চন্দনের নক্সা কাটা হইল। কপালে চন্দনের ফোঁটা। কনে সাজান শেষ হইলে মেয়েরা একবাক্যে বলিয়া উঠিল, কি চমৎকার। এমন একটা রূপসী লাখে একটা মেলে না।

বর আসিলেন। প্রায় নীরবে, নিঃশব্দে। গাড়ী হইতে নামিয়াই একেবারে বিবাহের আসরে। সেখানে সব প্রস্তুত ছিল। বিবাহ অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়া গেল। এদিকে কমলবাবু পাশের একটা ঘরে দুই-তিনজন বরযাত্রী সহ আরো কয়েকজন যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদিগকে খাওয়াইয়া দিলেন। বরের সঙ্গী একজন বাদে আর সকলেই চলিয়া গেলেন।

বিবাহ-অনুষ্ঠান শেষ হইলে বরকনে বাসরঘরে গেল। সেখানে লতিকা, বীণা আর পাড়ার চার-পাঁচটি মেয়ে ও বউ। কোনমতে নিয়মপালন করিয়া তাহারা সরিয়া পড়িলেন। যাইবার সময়ে সকলেই একবাক্যে বলিলেন, মেয়েটার কি পোড়াকপাল!

বাসরঘরে কি হইয়াছিল, আমরা জানি না তা। তবে অলকার মুখ অত্যন্ত গম্ভীর ছিল। কিন্তু সে গাম্ভীর্য সত্ত্বেও তাহার অনুপম রূপলাবণ্য বৃদ্ধের মনে অমৃত সিঞ্চন করিতেছিল।

পরদিন সকালে এক কাপ চা ও খাবার খাইয়াই বরের একটি সঙ্গীর সঙ্গে বধূকে লইয়া একখানি ট্যাক্সি করিয়া বৃদ্ধ স্বগৃহে আসিয়া উপনীত হইলেন। হরিহর নিজের ফ্ল্যাটে ফিরিয়া আসিয়া মুখ গোমড়া করিয়া বসিয়া রহিল।

৪

বরের বাড়ী। প্রকাণ্ড প্রাসাদ। আত্মীয়-স্বজন, দাস-দাসীতে ভরা। বড় বড় ...র। মার্বেল, মোজেইকে মোড়া। দামী দামী আসবাবপত্র। বড় বড় আয়না। বধূ ...রণের পর্ব শেষ হইল। আহারাদি হইল। আত্মীয়স্বজনের কলরবে বাড়ী মুখরিত। ...লশয্যার রাত্রি পর্যন্ত প্রায় সর্বদাই একটা-না-একটা আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ...লিতে লাগিল। নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ সব সমারোহ-সহকারেই সম্পন্ন হইল। ইতিমধ্যে ...রিহর আসিয়া দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় হিসাবে অলকাকে দুইবার দেখিয়া গিয়াছে। ...খামাত্রই অলকার চোখ ছল ছল করিয়া উঠিয়াছে, কোন কথা বলিতে পারে নাই। ...লিবার মত কথা কিই বা আছে!

ফুলশয্যার আনুষ্ঠানিক ব্যাপার শেষ হইল। বর সদানন্দকে উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার নাতনী ও নাতবৌরা একটু রসিকতা করিল। তারপর বলিল, দাদু তোমার বউ রইল, একটু দেখো শুনো, আমরা চললুম।

ঘর খালি হইয়া গেল।

অলকা মনে মনে সমস্ত ব্যাপারটাকেই একটা প্রকাণ্ড অভিনয় মনে করিতে লাগিল। মনে মনে বলিল, সবই তো হ'ল। এখন বুড়োটা শিগগির মরলে হয়। দেখে মনে হচ্ছে, দু'এক মাসের বেশি বাঁচবে না। এরই মধ্যে দু'দুবার প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল।

অলকা ধীরে ধীরে বরকে বলিল, সারাদিন নানারকম ঝঞ্ঝাট গেছে, খুব ক্লান্ত হয়েছ, এখন ঘুমিয়ে পড়।

ঘুম কি আর অমনি আসবে? ওই দেরাজটার মাঝে একটা কৌটোয় কব্‌রেজের একটা ওষুধ আছে। এনে দাও তো।

অলকা ওষুধ আনিয়া দিল। ওষুধ খাইয়া বৃদ্ধ সদানন্দ একটু পরেই ঘুমাইয়া পড়িলেন। অলকাও শুইয়া পড়িল।

পরদিন হইতে চলিল অলকার অভিনয়, রাত্রিদিনব্যাপী ননস্টপ অভিনয়। নাতনীরা ঘিরিয়া ধরে, ঠাকুমা, ঠাকুমা বলিয়া। পুত্রবধূরা, বউমা, বউমা, বলিয়া ডাকেন, আদর করেন, তাহার অসামান্য রূপের প্রশংসা করেন। দাস দাসীরা সাক্ষাৎমাত্র সমীহ করে, সেবাযত্নের জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া থাকে, পরোক্ষে একটু মুচকি হাসে। কেহ বলে, ও সিঁথির সিঁদুর আর কদিন!

সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায়- রাত্রে আহার্যের কি ধুম! অলকা একটু একটু মুখে দিয়াও শেষ করিতে পারে না। বাড়ীর গৃহিণীরা, বৌরা নূতন 'বৌমাকে' লইয়া আজ এখানে, কাল সেখানে বেড়াইতে যায়। দু'এক দিন অন্তরই তাহারা বৌমাকে লইয়া সিনেমায় যায়, থিয়েটারে যায়। সদানন্দ সঙ্গে যাইতে পারেন না। তাহাতে কাহারও কিছু আসে যায় না।

অলকা স্বামীকে সেবা করে অর্থাৎ সেবার অভিনয় করে। সময়মত ঔষধ দেয়, তৃষ্ণা পাইলে জল, শরবত প্রভৃতি দেয়, ফিট হইবার উপক্রম হইলেই নির্দিষ্ট ঔষধ খাওয়াইয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করে। কখনো মাথায় হাত বুলায়, কখনো পিঠ চুলকাইয়া দেয়, কখনো একটু পা টিপিয়াও দেয়। একটি দিন-রাতের নার্স আছে। তাহাকে বেশি কিছু করিতে দেয় না অলকা। স্নান করান, প্রভৃতি অত্যাবশ্যক কয়েকটি কাজ সে করে। আর যখন অলকা বাড়ীতে থাকে না,

তখন সে বৃদ্ধের পাশে বসিয়া থাকে। অলকা এক-একদিন হঠাৎ একটু-আধটু প্রেমের অভিনয়ও করিয়া ফেলে।

একদিন বৈকালে হরিহর আসিয়াছে সাক্ষাৎ করিতে। দু'একটি কথার পর হরিহর ফিসফিস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বুড়োর শরীর কেমন? আর কতদিন?

অলকা বলিল, শরীর যেন আগের চেয়ে একটু ভালর দিকেই মনে হচ্ছে। কি যে আছে কপালে জানিনে। হরিহর মুখ গম্ভীর করিয়া উঠিয়া গেল।

৫

হরিহর মাঝে মাঝে খবর নেয়। প্রতিবারই শোনে সদানন্দ আগের চেয়ে বরঞ্চ একটু ভালই আছে। কি মুশকিল! সদানন্দের প্রতিবেশীরা বলে, বুড়োর কি বরাত! চ্যবনপ্রাশের সঙ্গে তরুণী ভার্যা পেয়ে আয়ু বেড়ে যাচ্ছে।

একদিন হরিহর আসিয়া অলকার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কানে কানে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা উইল-টুইল—

অলকা বলিল, হ্যাঁ। সেদিন রাত্রে আমাকে কত আদর করে বললেন, তুমিই আমার প্রাণ। আর যত সব দেখছ বাড়ীতে ওরা কেউ নয়। আমি আমার ছ'লাখ টাকা উইলে শুধু তোমাকেই দিয়েছি। বুড়োর সে কি আকুতি। এক একদিন পেটের মধ্যে একটা অসহ্য যন্ত্রণায় যখন অস্থির হয়ে ওঠেন, তখন ডাক্তারের ঠিককরা একটা ঔষধ খেতে দিই। সেই ঔষধ খান আর বলেন, অলকা আমার সামনে বস! তোমাকে দেখলে আমার অর্ধেক ব্যথা কমে যায়!

হরিহর বলিল, তুমি কি বল?

আমি অভিনয় করে বলি, তোমার ব্যথা-ট্যথা সব সেরে যাবে আমি কাছে থাকলে।

সব সেরে যাবে?

সত্যিই যাবে নাকি! অভিনয়, সব অভিনয়!

হরিহর বাড়ী গিয়া ভাবিতে বসিল। অলকার অভিনয় সম্বন্ধে তাহার মনে কোন সংশয় নাই। কিন্তু বুড়োর খবর তো সুবিধার নয়। ক্রমে ভালর দিকেই যাচ্ছে!

হরিহর কয়েকদিন খুবই চিন্তা করিল। সে মনে করিয়াছিল দু'এক মাসের মধ্যেই ছ'লাখ টাকা হাতে আসিয়া যাইবে, কিন্তু একি হইল! বুড়ো মরে না কেন?

আরো কয়েকদিন গম্ভীর চিন্তার পর হরিহর কাগজে একটি বিজ্ঞাপন দিল,

প্রভূত বিত্তের অধিকারিণী বাহাত্তর বৎসর বয়স্কা মরণাপন্না বৃদ্ধা পাত্রী আবশ্যক। জাতিবিচার নাই। বক্স নম্বর ইত্যাদি।

এরূপ বিজ্ঞাপনের উত্তর আসিবে, একথা কেহই কল্পনা করিতে পারে না। কিন্তু ফ্যাক্টস্ আর স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিক্‌শন। কয়েকদিন পরে সত্যই উত্তর আসিল। হরিহর ব্যগ্রচিত্তে উত্তরটি পড়িয়া ফেলিল—

'মহাশয়। আমার বয়স বাহাত্তর, মরণাপন্ন বিধবা। আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিমাণ ছ'লাখ টাকার কম হইবে না। একটি ভয়ঙ্কর ভাইপো আমাকে ভীষণ জ্বালাতন করিতেছে। আপনি সত্বর আমাকে বিবাহ করিয়া আমাকে বাঁচান। আমার সব সম্পত্তি আপনাকে উইল করিয়া দিয়া যাইব।"

চিঠি পাইয়াই হরিহর পত্র লিখিয়া সম্মতি জানাইল এবং কয়েকদিন পরে গিয়া একেবারে পাকা দেখা শেষ করিয়া বিবাহের দিন স্থির করিয়া ফেলিল। বৃদ্ধা কমলিনীর পক্ষে তাহার একজন অ্যাটর্নি সব ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আত্মীয়-স্বজনেরা কেহ কেহ বিরক্ত হইলেও সাক্ষাৎভাবে কিছু বলিতে সাহস করিলেন না।

স্বল্প সমারোহে বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইল। বাসরঘরের মেয়েদের মধ্যে নাতনী-স্থানীযারা বেশ একটু মুখরা হইয়া উঠিল।

পরদিন প্রাতেই স্থির হইল, জামাই নিজ বাটিতে ফিরিবে না। কনের বাড়ীতেই ফুলশয্যা হইবে এবং অতঃপর হরিহর এখানেই স্থায়িভাবে বাস করিবে। ফুলশয্যার রাত্রে যখন সকলের আহারাদি শেষ হইয়াছে, তখন বর-কনে. আহারের আয়োজন হইল। বহুকাল অনভ্যাসের পরে মাছের মুড়া খাইতে গিয়া ক'নে একটা বিষম খাইয়া বিব্রত হইলেন। তাহার অপরূপ সাজ, সিঁথিতে সিঁদুর, গলায় জড়োয়া হার, মুখে চন্দন প্রভৃতি দেখিয়া সকলেরই মনে একটা অভূতপূর্ব ভাবের সঞ্চার হইল। একটি মেয়ে বলিল, সাতাশের পাশে বাহাত্তর মানিযেছে বেশ! দুই সাত আর সাত দুই, প্রায় একই তো! হরিহর মনে মনে বলিতেছে, যাক না কটা মাস, ছ'লাখ টাকা ট্যাকে করে যখন উধাও হব, তখন দেখবে মজাটা। হরিহরও বেশ একটু খুশি খুশি ভাব অভিনয় করিয়া ফেলিল।

সকলে বাসরঘর হইতে চলিয়া গেলে ক'নে বলিলেন, ওই দেরাজের মধ্যে আমার আফিমের কৌটাটা এনে দেবে?

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, বলিয়া হরিহর আফিমের কৌটা আনিয়া দিল। একডেলা আফিম খাইয়া কমলিনী বলিলেন, সারাদিন বড় ঝঞ্ঝাট গেছে, এখন একটু ঘুমোই। অন্য কথাবার্তা কাল হবে, কেমন?

হরিহর বলিল, কমলিনীরা তো রাত্রে ঘুমিয়েই থাকে।

ফিক করিয়া একটু হাসিয়া কমলিনী বিছানায় গড়াইয়া পড়িলেন।

৬

হরিহর একদিন গিয়াছে অলকার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে। দেখা হইবামাত্র অলকা বলিল, তুমি নাকি এক বুড়ী বিয়ে করেছ ?

ও কিছু নয়। শুধু একটা অভিনয়।

অভিনয় ?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ। নইলে বাহাত্তর বছর বয়সের বুড়ীকে কেউ বিয়ে করে নাকি ? ছ'লাখ টাকা উইল করে দিয়েছে। একবার চোখ বুজলেই ছ'লাখ টাকা পকেটস্থ করে উধাও! বুঝলে ?

তাহ'লে আপাততঃ দু'জনেরই অভিনয়ই চলুক।

আর উপায় কি ?

উপায় নেই সে তো দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু—

কিন্তু আর কি ? কটা মাস বই তো নয়। সদানন্দ ভালর দিকে যাচ্ছেন বলে, কত ভাল আর হবেন ? কোনদিন একটা ফিট হতে হতেই হয়তো তোমার মুক্তি হয়ে যাবে।

তোমার বুড়ীর খবর কি ? কতদিন আর বাঁচবেন বলে মনে হয় ?

ঠিক বুঝতে পারচিনে। সেদিন বলছিলেন, তোমাকে পেয়ে আমি বেঁচে গেছি। আমার শরীর অর্ধেক ভাল হয়ে গেছে। তুমি কাছে থাকলে আমি একেবারে সেরে উঠব।

বেশ, সুসংবাদ। সারাজীবন তবে অভিনয়ই চলবে ?

হরিহর বলিল, কিছু না। আমার এখনও বিশ্বাস আর কয়েক মাসের মধ্যেই আমরা মুক্তি পাব।

এ যে নিজের হাতে বোনা জাল। সহজে ছিঁড়বে কি ?

ছিঁড়বে, ছিঁড়বে। ও কথা থাক। আচ্ছা, সদানন্দ তোমাকে টাকা-পয়সা খুব দেয় নিশ্চয়ই। দিতে পার কিছু তার থেকে ?

অলকা বলিল, সে গুড়ে বালি। পানদোক্তা বাবদ মাসে আড়াই টাকা বরাদ্দ আছে। তার বেশি নয়। উইল প্রোবেটের আগে আর একটি ফুটো পয়সাও নয়। কেন, তোমার নতুন সোহাগী তোমাকে দু'চার হাজার টাকা দিয়ে দেয়নি ?

আর বলো না। সিনেমা-থিয়েটার বাবদ মাসে পাঁচ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এর পরে আর একটি পয়সাও নয়। বুঝতে পারছ না, যারা টাকা দিয়ে মানুষ কিনতে জানে, তারা টাকার হিসাব রাখতেও জানে। এরা তো আর মাস্টার কেরাণী নয় যে মাইনে পেয়ে দশ টাকার কইমাছই কিনে ফেললে, এদিকে বাজার দেনা মাইনের চেয়ে বেশি।

কেরাণীই তো ছিলে। কেন হ'ল এ দুর্মতি?

হরিহর সান্ত্বনা দিয়া বলিল, আহা কেন ব্যস্ত হচ্ছ, দেখই না কটা মাস। একটু অভিনয় বই তো নয়।

এমনি কথা প্রায়ই হয়। কিন্তু কোন সমাধান হয় না। দুজনেই অত্যন্ত ব্যাকুল। এমন করিয়া কতদিন চলে? অলকা লক্ষ্য করিতেছে, সদানন্দর শরীর ক্রমশই ভাল হইতেছে। অনেক উপসর্গ কমিয়া গিয়াছে। তাহার প্রতি আদরের মাত্রাও ক্রমশ বাড়িতেছে। কারণ, অলকাই তাহার স্বামীর দীর্ঘ আয়ুর কারণ। ওদিকে বৃদ্ধা কমলিনী শাড়ী গহনা পরিয়া দিন দিন সুস্থ হইয়া উঠিতেছেন। মৃত্যুর লক্ষণ দূর হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছে।

৭

একদিন হরিহর অলকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে অলকা বলিল, বুড়োটা অবশ্য খুবই বুড়ো, কিন্তু লোকটা খুব খারাপ নয়।

হরিহর বলিল, আমার বুড়ীটাও অবশ্য খুবই বুড়ী, কিন্তু মানুষটা নেহাত মন্দ নয়।

সত্যি, খুব আদর যত্ন করে। একটুখানি চোখের আড়াল হলে যেন ছটফট করতে থাকে।

বুড়ীটাও তাই। কেবলই বলে, বসো, আমার কাছে, বসে গল্প কর। আর বলে, এই যে বাড়ী-ঘর, ছেলে-মেয়ে, বউমারা, নাতিরা, নাতনীরা, সব তো তোমারই। আমি চোখ বুজলে এদের নিয়ে তুমিই তো ঘর করবে। সামলে-সুমলে চল।

আমার বুড়োটাও ঠিক অমনি সব কথা বলে। বলে, আমি শুধু টাকাই তোমাকে দিয়ে যাব, তা তো নয়। এই সব ছেলে-মেয়ে, জামাই, বউ, সবই তোমার। কচি বয়স, সাবধানে থেকো, ধর্মে মন রেখো, শ্বশুরকুলের মান রেখো, আরো কত কি? আচ্ছা, বুড়ীটা যখন তোমাকে ওই সব কথা বলে, তখন তুমি কি বল?

কি আর বলব? চুপ করে থাকি। তুমি তোমার বুড়োকে কি বল?

কি আর বলব? অনেক সময়ে চুপ করেই থাকি। তবে মাঝে মাঝে এক একদিন অভিনয় করে বলি, নিশ্চয়ই, খুব ভালভাবে থাকব, শ্বশুরকুলের মান রাখব।

হরিহর জিজ্ঞাসা করিল, তুমি সদানন্দকে 'তুমি' বল, না 'আপনি' বল?

অলকা বলিল, এতদিন 'আপনিই' বলতাম। কাল থেকে 'তুমি' বলছি। হাজার হোক, স্বামী তো?

আমিও কমলিনীকে এখন 'তুমিই' বলি। 'তুমি' শুনে বুড়ী ভারি খুশী।

তা খুশী না হবেন কেন? অমন পঁয়তাল্লিশ বছর ছোট বয়সের স্বামী পেলে সবাই খুশী হয়।

তোমার বুড়োও নিশ্চয়ই বাহান্ন বছর ছোট বয়সের ক'নে পেয়ে একেবারে গলে গেছেন?

তা গেছেন বৈ কি।

আচ্ছা তুমি গলে যাওনি তো?

মশায়ের খবর কি? নাতি-নাতনীরা সব ছেঁকে ধরেনি?

আচ্ছা, ওসব কথা থাক। একটু কাজের কথা বলি। দেখ, ব্যাপার যা দেখছি, তাতে ওঁদের মরবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এখন একমাত্র উপায়, উইলে ওঁদের সই করিয়ে নিয়ে, আর সেই উইল দুটো হস্তগত করে সরে পড়া।

অলকা বলিল, তারপর?

তারপর, আমাদের বিরহে ওঁদের অসুখ নিশ্চয়ই বেড়ে যাবে। সদানন্দর ঘন ঘন ফিট হবে। কমলিনীর ভাইপোর দোরাত্ম্য ভীষণ বেড়ে যাবে। সুতরাং ওঁদের আয়ুও ফুরিয়ে যাবে। ওঁদের মৃত্যুসংবাদ পেলেই আমরা আবার ভেসে উঠব, বাড়ী ফিরব উইলের প্রোবেট নিয়ে—বাস্ দুজনে সরে পড়ব।

অলকা বলিল, ছেলে মেয়ে, নাতি-নাতনীরা যদি না ছাড়ে?

ছাড়বে না বললেই হ'ল। ছাড়াতেই হবে।

ব্যাপারটা কিন্তু খুব বিশ্রী হয়ে যাবে। বিয়ের পর দু'চার মাসের মধ্যে যা হোক একটা হয়ে যেত, কথা ছিল না। কারো সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা হত না। কিন্তু এতদিন পরে, ওঁদের পরিবারের সঙ্গে, আত্মীয়জনের সঙ্গে আমরা যে একেবারে মিশে গেছি!

তাহলে তুমি কি বল? যেমন চলছে এমনি চলবে? মাঝে মাঝে তোমার আমার—

কি, থামলে যে?

মানে, মাঝে মাঝে তোমার আমার এইরকম অভিসার ?

জানিনে বাপু, আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। কি যে এক কাণ্ড করে বসলে, এখন কি ক'রে যে এর সমাধান হবে, বলতে পারিনে। উইল নিয়ে পালানো সম্ভব হবে বলে আমার মনে হয় না। এখন ওঁরা কেউই উইলে সই করবেন না। ওঁরা বুড়ো হ'লেও ওঁদের মাথা খুব ঠিক আছে। আমাদের বিয়ের পর থেকে দেখছি, তুমিও নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ, ওঁদের শরীর ও মন দুইই বেশ সতেজ ও স্বাভাবিকই আছে।

তা'হলে উপায় কি ?

ভাবিতে উচিত ছিল, প্রতিজ্ঞা যখন। বলেছিলাম না, বিয়ে-টিয়ে নিয়ে খেলা করতে নেই।

হরিহর ও অলকা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। হরিহর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আচ্ছা অলকা, কিছুদিনের জন্য তুমি আর আমি পালিয়ে গিয়ে অন্য কোথাও থাকলে হয় না। কোন একটা অজুহাতে পার না চলে আসতে ?

কি পাগল ! তা কি হয় ?

তা'হলে উপায় ?

কোন উপায়ই নেই। আচ্ছা, আজ আমাকে এখন উঠতে হচ্ছে, বুড়ো এখুনি আমার খোঁজ করবে।

তুমি একটু ভেবে দেখো, অলকা।

তা দেখব, কিন্তু পাগলামী করে তুমি যে জট পাকিয়েছ, সে জট আর খুলবে বলে আমার বিশ্বাস হয় না।

হরিহর বিদায় লইল।

আরো কয়েক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সদানন্দ ও কমলিনী বেশ বাঁচিয়া আছে। হরিহরকে প্রায়ই দেখা যায়, অতি বিষণ্ণমুখে হেদোর একটি বেঞ্চির উপরে বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া আছে।

অগাষ্ট, ১৯৫৫

ব্রহ্মস্পর্শ

সত্যেশ পাকড়াশী সম্প্রতি একটি চাকুরি পাইয়াছে। সুতরাং বাড়ীতে তাহার বিবাহের প্রস্তাব উঠিয়াছে। কিন্তু সত্যেশ একেবারেই রাজী নয়। অনুরোধ, উপরোধ চলিতেই থাকে, কিন্তু কোনই ফল হয় না। বিরক্ত হইয়া সত্যেশ একদিন বলিল, দেখ, যদি তোমরা এমন করে বিরক্ত কর, তাহলে আমি বাড়ী ছেড়ে চলে যাব।

ইতিমধ্যে পূজার ছুটি আসন্ন হইয়াছে।

একদিন সত্যেশ তাহার পিসিমাকে ডাকিয়া বলিল, আমি কিছুদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি।

পিসিমা বলিলেন, রাগ করে বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে বুঝি ?

না গো না। এই ছুটিটা একটু ঘুরে-টুরে আসি। পশ্চিমদিকেই যাব। ওদিকের জল-হাওয়া ভাল। শরীর মন একটু ভাল হবে। তাছাড়া তোমাদের ঘ্যানঘ্যানানি থেকেও একটু রেহাই পাওয়া যাবে।

তা বেশ তো। একটা ভাল দিনটিন দেখে যাত্রা করিস বাপু। তোমার মা বাবাকে বলেছ ?

বলিনি। তোমাকেই আগে বললাম। তুমিই না হয় ওঁদের বলো।

আচ্ছা, সে হবে'খন। ওঁরা কি আর অমত করবেন ? তবে যেখানেই যাও না কেন, একটা শুভদিন দেখে—

তোমার ঐ এক কথা। সবদিনই সমান। একদিন গেলেই হ'ল।

পিসিমা যথাসময়ে সত্যেশের মা ও বাবাকে বলিলেন। তাঁহারা বলিলেন, আচ্ছা, আসুক ঘুরে কয়েক দিন।

সত্যেশ আনন্দিত হইল। কোথায় যাইবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া যে-কোন একটা স্থানে যাইবে। আবার সেখান হইতে টিকিট করিয়া অন্য এক স্থানে যাইবে। এইরূপে টো-টো করিয়াই ছুটিটা কাটাইয়া দিবে।

যাত্রার আয়োজন চলিল কয়েক দিন। একটা সুটকেশ, একটা ছোট বিছানা, একটা টিফিনক্যারিয়ার, একটি জলের পাত্র, একখানা ব্র্যাডশ', দু' চারখানা বই,

কিছু জামা-কাপড়, দাড়ি কামাইবার আসবাব—মোটামুটি অত্যাবশ্যক কতকগুলি জিনিস সংগ্রহ করিয়া গুছাইয়া রাখা হইল।

পিসিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, সব গোছ-গাছ হ'ল?

হ্যাঁ, পিসিমা।

কবে যাত্রা করবি?

কাল।

কাল?

হ্যাঁ।

কি সর্বনাশ! কাল যে ত্র্যহস্পর্শ!

তাতে কি হ'ল। সব দিনই সমান।

তা কি হয়? কাল কিছুতেই যাওয়া হবে না।

সে কি পিসিমা! আমার যে টিকিট কেনা হয়ে গেছে। আর এই ভীষণ ভিড়ের দিনে কি টিকিট বদলানো যায়?

না, সে কিছুতেই হবে না।

নিশ্চয়ই হবে। আমার সব ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেছে।

কি আর বলব, বল। তোমরা আজকাল এমন সব জ্যাঠা হয়েছ যে, কারো কোন ভাল কথা শুনবে না।

সত্যি পিসিমা, ত্র্যহস্পর্শে যাত্রা না করার কোন মানে নেই। দেখো না ত্র্যহস্পর্শের দিন স্টেশনে গিয়ে, কেমন ভিড়!

যা ইচ্ছে করগে বাপু। কি আর বলব? দুর্গা! দুর্গা!

২

সত্যেশের বাড়ী হইতে স্টেশন বেশি দূরে নয়। একখানি রিক্শা ডাকিয়া তাহাতে জিনিসগুলি তোলা হইল। সত্যেশ কাপড়-জামা পরিয়া প্রস্তুত হইয়া মা বাবাকে এবং পিসিমাকে প্রণাম করিয়া আস্তে আস্তে রিক্শায় গিয়া বসিল। পিসিমার মনে ত্র্যহস্পর্শ অবিরত খোঁচা দিতেছিল। তিনি আজ সকাল হইতেই থাকিয়া থাকিয়া দুর্গা নাম জপ করিতেছিলেন। ছেলেবেলা হইতে বলিতে গেলে পিসিমাই কোলে পিঠে করিয়া সত্যেশকে মানুষ করিয়াছেন। রিক্শায় উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই পিসিমা 'দুর্গা দুর্গা' বলিয়া আঁচলে চোখ মুছিলেন।

রিক্‌শাওয়ালা একটি রোগা লিকলিকে ছোকরা বলিলেই হয়। ধীরে ধীরে রিক্‌শাটিকে টানিয়া টানিয়া পথ চলিতে লাগিল। সত্যেশ মুখটি ঘুরাইয়া বাড়ীর দিকে দুই-একবার তাকাইয়া স্থির হইয়া বসিল।

রাস্তার একটি মোড় ঘুরিবার সময়ে হঠাৎ সামনে একটা লরী আসিয়া পড়ায় রিক্‌শাওয়ালা চমকাইয়া উঠিয়া রিক্‌শাটিকে থামাইয়া ফেলিল। কিন্তু এই সময়ে তাহার হাতের মুষ্ঠি একটু শিথিল হইতেই সামনেটা উপরের দিকে উঠিয়া যাইতে লাগিল, চেষ্টা করিযাও নীচু করিতে পারিল না। বরং রিক্‌শাচালক ছেলেটিই রিক্‌শার হাতল ধরিযা ঝুলিতে লাগিল। এদিকে সত্যেশের মাথাটা প্রায মাটির কাছে আসিযা পড়িযাছে, পা উপরের দিকে, জোর করিয়া দুই হাত দিয়া রিক্‌শার ঢাকনিটা চাপিয়া ধরিয়া রহিয়াছে। অবস্থা দেখিয়া পথের অনেকগুলি লোক ছুটিয়া আসিল এবং তাহারা সত্যেশকে ধরিযা রিক্‌শা হইতে নামাইয়া রিক্‌শাটিকে সহজ অবস্থায় ফিরাইয়া আনিল। সত্যেশ বেশ একটু ঘাবড়াইয়া গিয়াছে। এমন সময়ে তাহার পরিচিত এক ভদ্রলোক গাড়ীতে পাশ দিযা যাইতেছিলেন। তিনি এই অবস্থা দেখিয়া সত্যেশকে বলিলেন, ওহে এস। কোথায় যাবে বলত? এস এই গাড়ীতে। সত্যেশ রিক্‌শাওয়ালার প্রাপ্য দিয়া জিনিসপত্র গাড়ীর পিছনের সীটের কাছে রাখিয়া তাহার ড্রাইভার বন্ধুর পাশে গিযা বসিল। বলিল, আমি তো শিয়ালদহ যাচ্ছিলাম—

বেশ তো, তোমাকে শিযালদহতেই পৌঁছে দিচ্ছি।

পিছনে ওঁদের অসুবিধা হবে না তো?

না, না, কি আর অসুবিধা হবে? কতক্ষণই বা লাগবে শিয়ালদহ পৌঁছতে?

গাড়ী বেশ একটু জোরেই চলিযাছে। ড্রাইভার ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় যাবে?

সত্যেশ বলিল, এই একটু পশ্চিমে বেড়াতে।

তা বেশ!

উহারা দু' একটা কথা বলিতে বলিতে যাইতেছে, গাড়ীখানাও বেশ একটু জোরেই চলিয়াছে, এমন সময়ে একটি ছোট ছেলে ধাঁ করিয়া বাঁ ফুটপাথ হইতে নামিয়া ডান ফুটপাথের দিকে দৌড়িতে লাগিল। চকিত হইয়া ভদ্রলোক সজোরে ব্রেক কষিলেন, গাড়ী থামিল। কিন্তু এই ব্রেকের ধাক্কায় সত্যেশ সামনের দিকে এত জোরে ধাক্কা খাইল যে তাহার মাথাটা সামনের উইণ্ডস্ক্রীণ ভেদ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। ভদ্রলোক 'হাঁ, হাঁ, কি হল, কি হল' বলিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া

পড়িলেন এবং স্টার্টার হাতলটা দিয়া সত্যেশের গলার নিকটবর্তী উইণ্ডস্ক্রীণের খানিকটা অংশ ভাঙিয়া ফেলিয়া আস্তে আস্তে সত্যেশের মাথাটা বাহির করিয়া আনিলেন। দেখা গেল, দু একটা জায়গা একটু ছড়িয়া যাওয়া ব্যতীত আর কোন বেশি আঘাত লাগেনি। ভদ্রলোক বলিলেন, খুব বেঁচে গেছ। গলায় কোন আঘাত লাগেনি ?

সত্যেশ শুধু বলিল, না।

কেহই আর কোন কথা বলিলেন না। গাড়ীখানি ধীরে ধীরে যখন স্টেশনে পৌঁছিল, তখন ট্রেণ ছাড়িতে মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি। সত্যেশ ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিয়া তাহার গাড়ীর ক্ষতির জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করিল। ভদ্রলোক বলিলেন, কি যে বল, তুমি যে প্রাণে বেঁচে গেছ, সেই আমার ভাগ্য। ভদ্রলোককে নমস্কার করিয়া সত্যেশ কুলির মাথায় জিনিস চাপাইয়া প্রায় ছুটিতে ছুটিতে ট্রেণে গিয়া বসিল।

৩

ট্রেণ ছুটিয়াছে। আপাততঃ সত্যেশ কাশী যাইতেছে। তারপর কোথায় যাইবে, তাহা এখন স্থির হয় নাই।

ট্রেণে বেশ ভিড়। কোনমতে এক স্থানে একটু বসিবার স্থান সংগ্রহ করিয়া জিনিসপত্র গুছাইয়া লইয়া একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতেছে। দ্রুতগামী ট্রেণ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্টেশন পার হইয়া অবিরত ছুটিতেছে। গাড়ীর দোলায় মনও একটু দুলিতেছে। ভাবিতেছে, গতানুগতিক একঘেয়ে জীবনের মধ্যে এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিযান কত মধুর! গাড়ীতে কত প্রকারের কত লোক! কত দেশের কত প্রকার ভাষা! সমস্ত গাড়ীটা কত প্রকার জিনিসপত্রে ঠাসা। বিছানা, বালিশ, লেপ, তোশক, বাক্স, ঝাঁকা, বোঁচকা, পুঁটলি, টিফিনক্যারিয়ার, ঘটি, কুঁজা, ছাতা, লাঠি, আরো কত কি ? সামান্য কয়েক ঘণ্টার গৃহস্থালী। তবু তারই মাঝে সব কিছুই আছে। শিশুর ক্রন্দন, মাতার আবেদন, পিতার ভৎর্সনা, বন্ধুর উপদেশ, সহযাত্রীর সমবেদনা, কলহ, কোলাহল, তরুণ-তরুণীর রঙীন চাঞ্চল্য, সবই আছে এই ক্ষুদ্র গতিশীল গৃহখানির মধ্যে। এক একটি স্টেশনে গাড়ী থামে, মানুষ ওঠে আর নামে, ঠিক যেন সংসার-গৃহে মানুষের জন্ম আর মৃত্যুর মত। আসে আর যায়। আসে, হাসে, খেলে, কাঁদে, আবার কোথায় নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।

বাংলাদেশ পার হইয়া আসিতেছে। বাঁশবন, আমবন, নারিকেল, সুপারির গাছ

ফুরাইয়া যাইতেছে। শ্যামল ধরণী ক্রমশঃ ধূসর হইয়া আসিতেছে। ভারী, ভিজা হাওয়া ক্রমশঃ হালকা ও শুকনো হইয়া আসিতেছে। সত্যেশের মনটাও ইতিমধ্যে বেশ একটু হালকা মনে হইতেছে। রিক্‌শা ও মোটর গাড়ীর কাহিনী প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে।

বহু পল্লী, নগর উত্তীর্ণ হইয়া ছুটিয়া চলিযাছে উদ্দামগতি ট্রেণ! সন্ধ্যা নামিতেছে। গাড়ীর ভিতরের আলোগুলি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। শিশুরা সমস্ত দিনের দোলানি ও ঝাঁকানিতে যেন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। মহিলাদিগের কাহারও পায়ে খিল ধরিয়াছে, কাহারও কোমর টনটন করিতেছে। যাঁহারা একটু স্থূলকায়, তাঁহারা ক্রমাগত ঘামিতেছেন এবং হাঁসফাঁস করিতেছেন। কেহ কেহ একটা বড় স্টেশন পাইলেই, একটু নামিয়া পায়চারি করিযা আসিতেছেন, কুঁজায় জল ভরিয়া আনিতেছেন, খাবার কিনিয়া আনিতেছেন। মোটের উপর একটা ক্লান্তি ও অবসাদের ছায়া সর্বত্র নামিয়া আসিযাছে।

ট্রেণের তো ক্লান্ত হইলে চলিবে না। তাহাকে ছুটিতে হইবে প্রবলগতিতে। মাঠের মধ্য দিয়া, নগরের পাশ দিয়া, পাহাড়ের গা ঘেঁষিয়া, নদীর বুকের উপর দিয়া ট্রেন ছুটিয়া চলিয়াছে উচ্ছল আনন্দে, শত শত নর-নারীর আশা ও আনন্দের বোঝা বহিয়া, তাহাদের কলগুঞ্জনের তালে তালে নিজের লৌহ-ঘর্ঘর ধ্বনির তাল মিশাইয়া!

কিন্তু সহসা একি! সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে অতর্কিতে একি প্রচণ্ড আঘাত! সমস্ত গাড়ীখানি এক মুহূর্তে একি হইয়া গেল? সত্যেশ সাংঘাতিক একটা ধাক্কা খাইয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। চারিদিকে ভীষণ আর্তনাদ! একটা হৃষ্ট পুলকিত মানব-সংসারে একি সাংঘাতিক বিপত্তি! সত্যেশের গাড়ীখানি উল্টাইয়া গিয়াছে। বেঞ্চিগুলি ভাঙিয়া গিয়াছে। মানুষগুলির যে কি হইয়াছে, তাহা কল্পনার অতীত!

বিপরীত দিক হইতে আগত একখানি মাল গাড়ীর সহিত সংঘর্ষের ফলেই এই সাংঘাতিক অবস্থা। বহু ঘণ্টা পরে যখন পুলিশ এবং অন্যান্য উদ্ধারকারীর দল সত্যেশকে এই ভগ্নস্তূপের মধ্য হইতে টানিয়া বাহির করিল, তখন দেখা গেল একটি নূতন লেপের বাণ্ডিলের নীচে চাপা পড়ায় তাহার দেহটি অক্ষত আছে, তবে ধাক্কার ফলে সংজ্ঞালোপ হইয়াছে। ডাক্তারদের চেষ্টায় ক্রমশঃ সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল এবং নিকটবর্তী স্থান অনুসন্ধান করিতে তাহার জিনিসপত্রও পুনরুদ্ধার করা গেল। কয়েক ঘণ্টা বিশ্রামের পর, রেল লাইন আপাততঃ কার্যকরী হইলে, অন্য একখানি ট্রেণে করিয়া সত্যেশ পুণ্য বারাণসীধামে উপস্থিত হইল।

৪

কয়েক দিন বেশ কাটিল। একটি হোটেলে থাকে, সকাল-বিকাল এখানে-সেখানে বেড়ায়। কোন দিন হয়তো বিশ্বনাথের মন্দিরে গিয়া দর্শন করিয়া আসে।

এ অঞ্চলের আবহাওয়া এবার যেন একটু অদ্ভুত। এখনও বর্ষার রেশ কাটে নাই। আকাশ বাতাস কেমন যেন থমথমে। মাঝে মাঝে ঝড়ের আভাসও পাওয়া যায়। তবু বাংলাদেশ হইতে কত পৃথক। সত্যেশ এই পরিবর্তন বেশ উপভোগ করিতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে সত্যেশ গঙ্গার ঘাটে বেড়াইতেছে। বহু নর-নারী বিবিধ ভূষণে ভূষিত হইয়া বিবিধ প্রকার আনন্দ উপভোগে ব্যাপৃত। সত্যেশ একবার গঙ্গার দিকে চাহিয়া দেখিতে পাইল, অনেকগুলি নৌকায় অনেকগুলি নর-নারী প্রমোদ ভ্রমণে বাহির হইয়াছে। কোন কোন নৌকা হইতে সঙ্গীতের সুরও ভাসিয়া আসিতেছে। সঙ্গীহীন হইলেও সত্যেশের ইচ্ছা হইল একবার একখানি নৌকা লইয়া একটু নৌকাবিহার করে। ঘাটের নিকটেই অনেক নৌকা ছিল। একখানির মাঝিকে ডাকিয়া দুই ঘণ্টার জন্য তাহার নৌকাখানি ভাড়া করিয়া নৌকায় উঠিয়া মাঝিকে বলিল, তোমার যেদিকে ইচ্ছা যেতে পার। দু'ঘণ্টা পরে আবার আমাকে এখানেই নামিয়ে দেবে।

মাঝি সম্মত হইল। নৌকাখানি হেলিয়া-দুলিয়া চলিল। ঝিরঝিরে হাওয়ায় সত্যেশের মনপ্রাণ শীতল হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে সত্যেশ তন্দ্রাভিভূত হইয়া শুইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে সহসা একটা ভীষণ ধাক্কা খাইয়া সত্যেশ জাগিয়া উঠিল। আকাশ ভীষণ মেঘাচ্ছন্ন। শোঁ-শোঁ করিয়া বাতাস বহিতেছে! নৌকাখানি একবার এপাশে এবং পুনরায় অন্য পাশে ভয়ানকভাবে দুলিতেছে। মাঝিরা ভীত হইয়া উঠিয়াছে এবং প্রাণপণে নৌকাখানিকে তীরের দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু তাহাদের সকল চেষ্টাই বৃথা হইল। একটা দমকা বাতাসের চাপে নৌকাখানি সহসা উল্টাইয়া গেল। মাঝিরা জলে ঝাঁপ দিয়া সাঁতরাইয়া তীরে উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু সত্যেশ সাঁতার জানে না। সে উল্টানো নৌকা ধরিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সহসা নৌকাখানি আবার উল্টাইয়া সোজা হইল বটে, কিন্তু ক্রমশঃ ডুবিয়া যাইতে লাগিল। সত্যেশ নৌকার মাস্তুলটি ধরিয়া ক্রমশঃ উপরে উঠিতে লাগিল। এইরূপ অবস্থায় ভাসিতে ভাসিতে নৌকাখানি একস্থানে আসিয়া

আটকাইয়া গেল। বোধ হয়, সেখানটায় একটা চর ছিল। নৌকাখানি সমগ্রভাবে ডুবিয়া রহিল। শুধু মাস্তুলের ডগাটা জলের উপরিভাগে রহিল এবং তাহার উপরে প্রাণপণে মাস্তুল জড়াইয়া ধরিয়া রহিল সত্যেশ।

ক্রমশঃ ঝড় কমিল, জলরাশি শান্ত হইল। আকাশ ক্রমশঃ একটু পরিষ্কার হইল। গঙ্গায় বহু নৌকা আবার চলাচল আরম্ভ করিল। একখানি নৌকাকে নিকটে পাইয়া সত্যেশ চীৎকার করিয়া উঠিতে নৌকার মাঝি নৌকাখানিকে তাহার নিকটে লইয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়া নৌকায় তুলিল। ক্লান্তিতে ও অবসাদে সত্যেশ মৃতবৎ পড়িয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া তাহার বাসস্থানের কথা মাঝিকে জানাইল। মাঝি বলিল, সে তো অনেক দূর!

সত্যেশ বলিল, আমাকে সেখানে পৌঁছে দিতেই হবে।

মাঝি বলিল, তা দিতে পারি। কিন্তু মোটা বকশিশ চাই।

তা পাবে।

মাঝি নৌকা ঘুরাইয়া সত্যেশকে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিল। সত্যেশ যখন নিজের হোটেলে ফিরিল, তখন রাত্রি সাড়ে তিনটা।

৫

কাশী আর সত্যেশের ভাল লাগিতেছে না। গঙ্গায় তাহার প্রাণটা প্রায় গিয়াছিল আর কি!

সত্যেশ ভাবিতে লাগিল, এক শহর ছেড়ে আর এক শহরে এলাম। তার চেয়ে দিন কতক কোন একটা গ্রামে গিয়ে থাকলে বোধ হয় নূতনত্বও হতো, ভালও লাগতো। মনস্থির করিতে আরও দুদিন কাটিল। পরে একদিন হোটেলের দরওয়ানকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা নিকটে পাড়াগাঁয়ে কিছুদিন থাকবার ব্যবস্থা করতে পার?

দরওয়ান খৈনি মুখে পুরিয়া একটু চিন্তা করিয়া বলিল, হ্যাঁ, পারি।

কোথায়?

নিকটেই। এখান থেকে সাতাশ মাইল গরুর গাড়ীতে গেলে নন্দপুরা গ্রাম। সেখানে বহু বিশিষ্ট লোকের বাস। সেখানকার বাসিন্দারা প্রায় সকলেই কলিকাতা

বোম্বাই, দিল্লী প্রভৃতি শহরে বড় বড় ব্যবসা করে বড়লোক হয়েছেন। খুব ধনী গ্রাম। বেশ আরামে থাকবেন।

কে নিয়ে যাবে আমাকে সেখানে ?

আমি সঙ্গে বিশ্বস্ত লোক দেব।

সত্যেশ প্রস্তুত হইল। পরদিনই গরুর গাড়ীতে করিয়া সত্যেশ নন্দপুরা যাত্রা করিল।

মাঝে দুই স্থানে বিশ্রাম করিতে হইল। গরু দুইটিকে বিশ্রাম করাইযা, খড় প্রভৃতি খাওযাইযা তারপর আবার যাত্রা। অধিকাংশ পথই গাড়োযান ঘুমাইতে বা ঝিমাইতে থাকে, বলদ দুইটি নিজে নিজেই মৃদুমন্দগতিতে অগ্রসর হয। কোন স্থানে একটা গর্তে চাকা পড়িলে ধাক্কা খাইয়া গাড়োযান জাগিয়া উঠে এবং গরু দুইটিকে যা-তা বলিযা গালাগালি করিযা তাহাদের লেজ সজোরে মুচড়াইয়া দিয়া আবার ঝিমাইতে থাকে। এমনি করিয়া একটি দিন এবং একটি রাত্রি অতিবাহিত করিয়া সত্যেশ নন্দপুরায় পৌঁছিল।

তাহার সঙ্গীটি পথ দেখাইযা এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে গিয়া গাড়ী থামাইল। সে নিজে আগে গিয়া গৃহস্বামীকে সব কথা বুঝাইয়া বলিলে সে মহানন্দে অগ্রসর হইয়া আসিয়া সত্যেশকে অভ্যর্থনা করিল। সত্যেশ কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, কয়দিনের জন্য আপনাদের একটু বিরক্ত করতে এলাম, অপরাধ নেবেন না।

গৃহস্বামী বলিলেন, সে কি কথা! আপনি আমাদের অতিথি, আমাদের কত সৌভাগ্য। এত কষ্ট করে আমাদের বাড়ীতে এসেছেন। যতদিন ইচ্ছা থাকুন। কোন অসুবিধা হবে না। সত্যেশ সানন্দে আতিথ্য গ্রহণ করিল।

গৃহস্বামী বৃদ্ধ। তিনি দেশেই থাকেন। তাঁহার পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতি অধিকাংশ আত্মীয়ই বিদেশে। অনেকেই বেশ বড় বড় ব্যবসায়ে লিপ্ত। ইনি দেশে থাকিয়া দেশের জমি-জমা এবং অন্যান্য সম্পত্তি দেখাশুনা করেন। দেখিলেই বুঝা যায, বেশ ধনী এবং মানী।

সত্যেশ খায়, ঘুমায়, বেড়ায়। মাঝে মাঝে বৃদ্ধের সহিত আলাপ করে। খাঁটি-ঘি-মাখানো মোটা মোটা রুটি এবং অড়হরের ডাল খাইযা সত্যেশের চেহারায ইতিমধ্যেই একটু জৌলুষ দেখা দিয়াছে। বাড়ীতে কয়েকটি মহিলা ও তরুণী আছেন। তবে তাঁহারা বেশ একটু দূরে দূরেই থাকেন। সত্যেশের সহিত পরিচয়ের কোন প্রয়োজন বা সম্ভাবনা দেখা যায় না। তবে তাঁহাদের হাতের রান্নার এবং অন্য প্রকার সেবা-যত্নে কোন ত্রুটি হয় না।

একদিন বৃদ্ধ একটু চিন্তিতভাবে সত্যেশকে বলিলেন, একটা বড় মন্দ খবর পেলাম।

সত্যেশ বলিল, কি ব্যাপার?

বৃদ্ধ বলিলেন, এখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে রঙ্গিলা নামে একটি দুর্দান্ত নদী আছে। এবার নাকি তার দুইটা বাঁধ ধ্বসে যাবার উপক্রম হয়েছে। যদি তাই হয়—

সত্যেশ উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, তাহলে কি হবে?

আমাদের গ্রাম জলের তোড়ে ভেসে যাবে।

কি সর্বনাশ! এর কোন প্রতিকার নেই?

চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু—

তাইতো, এ তো ভীষণ দুশ্চিন্তার কথা!

উভয়ে অতিশয় চিন্তাভারাক্রান্ত চিত্তে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

দুইদিন পরে। রাত্রি প্রায় এগারটা। সত্যেশ এই মাত্র ঘুমাইয়াছে। হঠাৎ একটা ভীষণ কোলাহল শুনিয়া জাগিয়া উঠিতেই সে শুনিতে পাইল, চারিদিকে ভীষণ চীৎকার, ক্রন্দন, ডাকা-ডাকি, হাঁকাহাকির শব্দ। একটু পরেই সবিস্ময়ে দেখিল, তাহার ঘরের মধ্যে সবেগে জল প্রবেশ করিতেছে। ঘর হইতে বাহির হইতেই দেখিল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জলের ঢেউ একটার পর একটা আসিয়া সমস্ত বাড়ীখানাকে প্রায় ডুবাইয়া ফেলিল। জল যখন তাহার মাথার উপর পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে, তখন অনন্যোপায় হইয়া সম্মুখস্থ একখানি প্রকাণ্ড ভাসমান কাষ্ঠখণ্ড জড়াইয়া ধরিয়া ভীষণবেগে ভাসিতে আরম্ভ করিল। বাড়ীর অন্য লোকদের কাহার কি অবস্থা হইল, তাহার সংবাদ লইবার কোন সুযোগ বা অবসর পাইল না।

৬

ভীষণ বেগে সত্যেশ ভাসিয়া চলিয়াছে। এই অঞ্চলটি একদিকে খুব ঢালু তাই জলের বেগও অতিশয় প্রবল। এইরূপ ঢালু হওয়ায় আশার কথা এই যে, জল আবদ্ধ হইয়া থাকিবে না। শীঘ্রই জল সরিয়া আবার স্বাভাবিক অবস্থা হইবে। কিন্তু কত শীঘ্র এই অবস্থা হইবে? আপাততঃ ক্রমাগত সে ভাসিয়াই চলিয়াছে। বহুক্ষণ পরে একস্থানে আসিয়া একটি গাছের মাথার নিকটে কাষ্ঠখণ্ডটি আটকাইয়া গেল। সত্যেশ একবার মনে করিল, কাঠখানাকে সরাইয়া লইয়া আবার ভাসিয়া

চলে, হয়তো কোন লোকালয় পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিল জলের যেরূপ বেগ, তাহাতে এই অবস্থা বেশী সময় স্থায়ী হইতে পারে না। জল কমিবেই। সুতরাং এই গাছেই আশ্রয় লওয়া যাক। এই মনে করিয়া কাঠখানাকে সাবধানে গাছের দুইটি ডালের মধ্যে আটকাইয়া রাখিয়া সে নিজে একটি ডালে বসিয়া রহিল।

চারিদিকে ধূ ধূ করিতেছে জলরাশি। প্রবলবেগে বহিয়া যাইতেছে গাছের ডাল, ঘরের চাল, গরু, মহিষ, হয়তো দুই-চারিটি মানুষও। এ কি ভয়ঙ্কর অবস্থা! মানুষগুলি খুব সম্ভব তাহারই মত বিভিন্ন গাছের ডালে আশ্রয় লইয়াছে। কত শিশু, কত রুগ্ন মানুষ, তাহাদের কি অবস্থা হইয়াছে। সত্যেশ আর ভাবিতে পারিতেছে না। কি কুক্ষণেই বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল। পর পর কেবলই সাংঘাতিক ব্যাপার! সবই যেন তাহারই জন্য পূর্ব হইতেই ব্যবস্থা করা ছিল।

গাছের ডালে বসিয়া জলের তাণ্ডব লীলা দেখিতেছে, এমন সময় সেই গাছেরই আর এক ডালে মনে হইল যেন কাপড়পরা কি একটা নড়িতেছে। একটু পরেই দেখিল, একটি তরুণী, তাহারই মত বিপন্ন হইযা গাছের ডাল আঁকড়াইয়া স্থির হইবার চেষ্টা করিতেছে। সত্যেশ অপলক নেত্রে চাহিযা রহিল। দেখিল, অপরূপ সুন্দরী একটি ষোড়শী গাছের ডাল আশ্রয় করিযা কোনমতে স্থির হইযা বসিল। তরুণীটিও এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে সত্যেশের দিকে চাহিতেই সবিস্ময়ে বলিযা উঠিল, সতিয়াশ বাবু!

সত্যেশের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। কে ডাকে তাহার নাম ধরিয়া এই সাংঘাতিক জলীয় পরিস্থিতিতে একটা লিচুগাছের আগডালে বসিয়া? ভূত-প্রেত নয তো। না, না, এ যে মানবী!

সত্যেশ বলিল, আপনি কি করে এখানে এলেন?

তরুণী উত্তর দিল, আপনি যেমন করে এলেন।

আমাকে চিনলেন কেমন করে?

আপনি তো আমাদের বাড়ীতেই ছিলেন।

আপনাদের বাড়ীতে?

হ্যাঁ, ওই বুড়ো আমার দাদু।

কি আশ্চর্য! তা বুড়ো কোথায়?

তা কেমন করে জানবো? তবে তিনি খুব শক্ত বুড়ো, খুব সাঁতার জানেন। একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করেছেন।

তরুণীটির মুখের রাষ্ট্রভাষা সত্যেশের কাণে মধু ঢালিয়া দিল। এ তো গোয়ালা গাড়োয়ানের রাষ্ট্রভাষা নয়, রেডিও-মাতানো গজল নয়, তবলা-ফাটানো খেয়ালও নয়। কি মধুর এর ভাষা!

সত্যেশ বলিল, আপনি আমার বাংলা কথা বুঝতে পারছেন?

নিশ্চয়ই। আমি যে কলকাতাতেই থাকি। আমার বাবা সেখানে মস্ত ব্যবসায়ী। কদিনের জন্য দাদুর কাছে বেড়াতে এসেছিলাম। তাছাড়া—

তাছাডা কি?

বলব আপনাকে?

বলুন না।

কিছু মনে করবেন না কিন্তু।

কেন মনে করব?

আমি বাঙালীরই মেয়ে। খুব ছোটকালে পথে হারিয়ে যাই। তারপর এঁরাই আমাকে লালন-পালন করেছেন। আমার আসল মা-বাবাকে তো আমি জানিনে। এঁরাও জানেন না।

তাতে কি হয়েছে। এখন তো আপনি এ দেরই মেয়ে।

হ্যাঁ। উঃ কি ঠাণ্ডা! কতক্ষণ যে এমনি করে থাকতে হবে, জানিনে।

এমনি করে অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য উপায়ও নেই।

তাই তো। যতক্ষণ জল না কমে, এমনি করেই সময় কাটাতে হবে। আপনি গল্প করুন না। আমি শুনি।

কি আর গল্প করব, বলুন।

আপনি কেন এখানে এলেন, এই সব বলুন।

যদি বলি, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

আহা, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার আর জায়গা পেলেন না, এই লিচু গাছের ডগা ছাড়া।

কই আর পেলাম।

ও কথা যাক। বলুন আপনার সব কথা।

সত্যেশ কি আর বেশি বলিবে। তবু সময় কাটানো চাই। কলিকাতা হইতে যাত্রা করিবার পরে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, সব পর পর বলিয়া গেল। তারপর বলিল, এইবার আপনার কথা বলুন।

আমার আবার কি কথা। বম্বেই তো, কলকাতা থেকে দাদুর কাছে বেড়াতে এসে এই লিচু গাছে আটকে গেছি।

এমনি করিয়া নানা কথার মধ্য দিয়া তাহারা পরস্পরের নিকট পরিচিত হইতে লাগিল এবং অধীর আগ্রহে জল কমিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

৭

জল কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। ঠাণ্ডায় এবং ক্লান্তিতে দুইজনেই অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে। জল যেমন একটু একটু করিয়া কমিতে লাগিল, উহারাও একটু একটু করিয়া নীচে নামিতে লাগিল। যখন উহারা পরস্পরের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, তখন সত্যেশ জিজ্ঞাসা করিল, আপনার নামটি তো বললেন না।

আপনিও কই একবারও জিজ্ঞাসা করেননি। আমার নাম লছমীয়া।

ক্রমশঃ উহারা মাটির কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু গাছের উপর হইতে একটু একটু করিয়া নীচে নামিতে উহাদের প্রায় একবেলা কাটিয়া গিয়াছে। ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, ক্লান্তিতে উভয়েই এমন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে যে, সামান্য কথা বলিতেও যেন কষ্ট হইতেছে।

মাটিতে নামিয়াই লছমীয়া একেবারে মাটিতে গড়াইয়া পড়িল এবং নিশ্চল হইয়া রহিল। সত্যেশ মনে করিল, লছমীয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু একটু পরেই বুঝিতে পারিল, নিদ্রা নয়, মূর্ছা। সত্যেশ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িল। তাহার নিজের অবস্থাও শোচনীয়, তথাপি এখনও ঠিক মূর্ছিত হইয়া পড়িবার মত হয় নাই। এখনই কিছু খাওয়াইতে না পারিলে হয়তো ও মূর্ছা আর ভাঙিবে না। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কোথাও কিছু নাই, লোকালয়ের চিহ্নও নাই। হতাশ হইয়া সে লছমীয়ার মাথার কাছে বসিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে সে লক্ষ্য করিল, একটা মস্ত গরু ওইদিকে আসিতেছে। গলায় প্রকাণ্ড দড়ি। সম্ভবতঃ কোন একটা উঁচু টিলার উপরে আশ্রয় লইয়াছিল, এখন ক্ষুধার তাড়নায় ঘাস খুঁজিতে ইতস্ততঃ ঘুরিতেছে। সত্যেশ উঠিয়া গিয়া গরুটিকে ধরিয়া আনিল। পাশের একটা গর্তের জল দিয়া যথাসম্ভব পরিষ্কার করিয়া গরুটিকে আনিয়া লছমীয়ার মাথার কাছে গাছের তলায় বাঁধিয়া তাহার দুধ দুহিবার জন্য তাহার পিছনের পায়ের সম্মুখে যুক্তাসন হইয়া বসিল। তারপর মূর্ছিত লছমীয়ার মাথাটা টানিয়া নিজের কোলের মধ্যে রাখিয়া তাহার মুখটি একটু ফাঁক

করিয়া এমনভাবে দুধ দুহিতে লাগিল যাহাতে দুধের ধারা লছমীয়ার মুখের ভিতর গিয়া পড়ে। প্রথমে দুধ লছমীয়ার ঠোঁটের কোণ বাহিয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু একটু পরেই একবার ঢক্ করিয়া একটু দুধ গিলিয়া ফেলিল। পরে আবার ঢক্। এইরূপে কয়েক ঢোক দুধ খাইবার পর লছমীয়া চোখ মেলিয়া এদিক-ওদিক চাহিয়া নিজের পরিস্থিতিটা দেখিয়াই উঠিয়া বসিতে গেল। কিন্তু সত্যেশ তাহার মাথাটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, আরও একটু দুধ খেয়ে নিন। এক সের আন্দাজ দুধ খাইবার পর লছমীয়া উঠিয়া বসিল এবং বলিল, এবার আপনি দুধ খান। আমি দুধ দুহিয়া দি।

সত্যেশ বলিল, আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না।

এই কথা বলিয়া সত্যেশ নিজেই মুখ লাগাইয়া খানিকটা দুধ খাইয়া লইল। ক্ষুধার তাড়নায় এটুকু করা আর এমন বেশি কি?

তারপর উহারা গরুর দড়ি খুলিয়া লইয়া উহাকে এদিকে-ওদিকে ঘুরাইয়া ঘাস খাওয়াইয়া আনিয়া গাছে বাঁধিয়া রাখিল। গরুর সহিত আপাততঃ ব্যবস্থা হইল, যতক্ষণ ইহারা বাধ্য হইয়া এখানে থাকিবে, ততক্ষণ ইহারা গরুকে ঘাস খাওয়াইবে, আর গরু ইহাদিগকে দুধ খাওয়াইবে।

কিন্তু এমন করিয়া কতক্ষণ কাটানো যায়। চারিদিকে ধূ ধূ মাঠ। কোন্‌দিকে গেলে কোথায় যাওয়া যাইবে, কিছুই বোঝা যাইতেছে না। একবার লছমীয়া বলিল, চলুন, যে-কোন একদিকে হাঁটতে আরম্ভ করি।

কিন্তু এই দুর্বল শরীরে কতটুকু হাঁটতে পারবেন?

দুইজনেই অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিল। তারপর উপবাসের পর অনেকখানি করিয়া দুধ খাইয়া উভয়েরই ভীষণ ঘুম পাইতেছিল। কথা বলিতে বলিতে একটু পরেই তাহারা ঘুমাইয়া পড়িল। গরুটিও তাহাদের পাশে বসিয়া পড়িয়া চোখ বুজিয়া রোমন্থন করিতে লাগিল।

৮

এমনি করিয়া বহুক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে। ক্লান্তির ঘুম, সহজে ভাঙে না। হঠাৎ তাহারা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া সবিস্ময়ে দেখিল, তাহাদের পাশে একখানা গরুর গাড়ী এবং তাহাতে দুইজন বলিষ্ঠ চালক।

জল কমিবার পরই লছমীয়ার দাদু ছয় সাতখানা গরুর গাড়ী চারিদিকে

পাঠাইয়াছিলেন লছমীয়ার এবং সত্যেশের খোঁজ করিতে। তাহারা যে দুইজনে একস্থানেই থাকিবে এবং এমনি অবস্থায় এতদূরে তাহাদিগকে পাওয়া যাইবে, তাহা কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই। লছমীয়া গাড়ীর চালকদের চিনিতে পারিল এবং সানন্দে গাড়ীতে গিয়া উঠিল। সত্যেশকেও সে ডাকিয়া লইয়া গাড়ীতে উঠিতে বলিল।

তাহাদের জীবনদাত্রী গরুটিকেও দড়ি দিয়া গাড়ীর পিছনে বাঁধা হইল। পুরা একটিবেলা কর্দমময় উঁচু-নীচু মাঠের পথ বাহিয়া তাহারা নন্দপুরায় পৌঁছিল।

দাদু হারানিধিকে ফিরিয়া পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। বলিলেন, আর দাদুর কাছে থেকে কাজ নেই। এবার ভালয় ভালয় বিদেয় হও। তোমাকে কালই আমি কলকাতায় পাঠাচ্ছি।

বেশ তো, আমি যাচ্ছি চলে। আমি তোমার একটা আপদ্ বইতো নয়।

ছিঃ, দিদিমণি, তুমি যে আমার মণি। কিন্তু এবার দৈবক্রমে কি ভীষণ কষ্ট পেয়ে গেলে। সত্যি, সত্যেশবাবু এখানে না থাকলে আর এমনি যোগাযোগ না হলে কি যে হতো, ভাবতেও পারিনে। তারপর সত্যেশকে বলিলেন, তুমিই একে বাঁচিয়েছ, নইলে—

সত্যেশ বিনীতস্বরে বলিল, সবই ভগবানের ইচ্ছা।

তারপর বৃদ্ধ বলিলেন, দেখ, লছমীয়া তোমার সঙ্গেই কলকাতা চলে যাক্। লছমীয়ার এক পিসি অনেকদিন ধরে বায়না ধরেছে কলকাতা যাবে. তাকেও নিয়ে যাও।

বেশ তো।

হাঁা, আর দেরি করে কাজ নেই। এখানকার বন্যার খবর খবরের কাগজে কলকাতার লোকেরা নিশ্চয়ই পেয়েছে। তারা কত ব্যস্ত হয়ে আছে। চিঠিপত্র দিয়ে খবর পাঠানোর এখন অনেক দেরি। এই বন্যায় ডাক-তার সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে।

সত্যেশ বলিল, কোন্ পথে যাওয়া যায় বলুন তো? যে পথে আমি এসেছিলাম, শুনলাম সে পথে এখনও গাড়ী চলতে পারবে না।

বৃদ্ধ বলিলেন, তাই তো।

বৃদ্ধ কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন। পরে বলিলেন, এক কাজ কর। শুনলাম, লছমনপুরার দিকে নাকি তেমন জল ওঠেনি। এখান থেকে বত্রিশ মাইল লছমনপুরা। সেখান থেকে সাত মাইল দূরে জানকীমঢ়ী এরোড্রোম। সেখান থেকে তোমরা প্লেনে চলে যাও।

তাহাই স্থির হইল। সত্যেশও অধীর হইয়া উঠিয়াছিল কলিকাতায় ফিরিবার জন্য। আহারাদি করিয়া, বিশ্রাম করিয়া, সামান্য জিনিসপত্র গুছাইয়া লইয়া দুইখানি গরুর গাড়ী প্রস্তুত করা হইল। একখানিতে সত্যেশ এবং একজন আত্মীয়, অপরখানিতে লছমীয়া এবং তাহার পিসিমা। তাছাড়া দুই গাড়ীতে দুইজন বলিষ্ঠ চালক।

চোখ মুছিতে মুছিতে দাদু বলিলেন, সাবধানে যেও। কলকাতায় পৌঁছেই তার করো। আর দেখ, পথে ক্ষিদে পেলেই লাড্ডুগুলো খাবে। লছমীয়া এবং সত্যেশ বৃদ্ধের পায়ের ধুলা লইয়া স্ব স্ব গাড়ীতে উঠিল।

দুইদিন এবং একরাত্রি পরে উহারা লছমনপুরায় পৌঁছিল। গাড়ীর ঝাঁকানিতে সত্যেশের সমস্ত হাড়গুলি যেন ঢিলা হইয়া গিয়াছে। লছমীয়াও খুব কাতর হইয়াছে। কিন্তু পিসিমার কোন ক্লান্তির লক্ষণ দেখা গেল না। তিনি প্রায় সমস্ত পথই নাক ডাকিতে ডাকিতে আসিয়াছেন। তাঁহার উল্কিশোভিত হাতখানি নাড়িয়া লছমীয়া ও সত্যেশকে বলিলেন, এ আর এমন কি পথ। এখন তো মোটর-বাসের কল্যাণে গরুর গাড়ী প্রায় চড়তেই হয় না। আমরা যখন ছেলেবেলায় শ্বশুরঘর যেতাম তখন চারদিন পাঁচদিন গরুরগাড়ীতে থাকতে হতো।

লছমীয়া বলিল, বেশ হতো, এখন কিছু খেতে দেবে তো দাও। আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।

লছমীয়া এবং সত্যেশ উভয়েই অনেকগুলি লাড্ডু খাইয়া এবং একঘটি করিয়া জল খাইয়া এক একটা শতরঞ্চি পাতিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। উঃ, শরীরে আর কত সয়!

বিশ্রামান্তে গাড়ীর চালক দুইজনকে এবং আত্মীয়টিকে মধুর সম্ভাষণে বিদায় দিয়া সত্যেশ লছমীয়া ও পিসিমাকে লইয়া মোটরবাসযোগে জানকীমঢ়ী আসিয়া পৌঁছিল। সেখানকার এরোড্রোমে গিয়া কলিকাতার জন্য তিনটি সীট রীজার্ভ করিল।

যথাসময়ে প্লেন ছাড়িল। লছমীয়া এবং সত্যেশ পাশাপাশি দুইটি সীটে। পিছনের একটি সীটে পিসিমা।

সত্যেশ বলিল, তুমি এর আগে প্লেনে চড়েছ?

সহসা 'তুমি' শুনিয়া লছমীয়া একটু হাসিয়া ফেলিল। বলিল, হ্যাঁ। বাবার সঙ্গে একবার বম্বে গিয়েছিলাম, আর একবার এলাহাবাদ।

বেশ লাগে, না।

বেশীক্ষণ কি ভাল লাগে, এমনি চুপ করে একজায়গায় বসে থাকা?

হোস্টেস আসিয়া এক কাপ করিয়া কোকো দিয়া গেল। কোকো খাইতে খাইতে সত্যেশ বলিল, পিসিমার বোধহয় ভয় কচ্ছে। তিনি কখনও বোধহয় প্লেনে ওঠেননি।

লছমীয়া বলিল, তা না উঠলে কি হয়। ওঁর ভয়ানক সাহস। কিছুতেই ভয় পান না।

একথা-ওকথা বলিতে বলিতে তাহারা তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িল। গত কয়েকদিন যাবৎ শরীরের উপর এবং মনের উপরে কম অত্যাচার হয় নাই।

সহসা একি! প্লেনখানা এমন একদিকে কাত হইয়া গেল কেন? এ আবার কি? অন্যদিকে যেন হেলিয়া পড়িতেছে। প্লেনের শব্দটাও যেন কেমন বেতালা! হোস্টেসটি একবার তাড়াতাড়ি আসিয়া বিশুষ্কমুখে বলিয়া গেল, সম্মুখে বিপদ, ভগবানের নাম করুন।

কিছুক্ষণ ধরিয়া প্লেনখানি চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিল। ইহার দমদম ঘাঁটিতে নামিবার সময় হইয়া গিয়াছে, অথচ এমন করিয়া বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতেছে কেন? কেন, সেকথা পাইলট ছাড়া আর কেহ জানে না।

প্লেনখানি চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমশঃ নীচে মাটির কাছে আসিয়া পড়িল এবং একটু পরেই কলিকাতার উপকণ্ঠে সল্টলেকের মধ্যে পড়িয়া গেল।

সত্যেশ এবং লছমীয়া অতিকষ্টে পিসিমাকে টানিতে টানিতে প্লেনের উপরিভাগে উঠিয়া আসিয়া একখানি ডানার উপরে কোনমতে বসিয়া পড়িল। জল খুব গভীর না থাকায় সমস্ত প্লেনখানি ডুবিয়া যায় নাই।

প্লেনের ডানার উপর একটু স্থির হইয়া বসিয়া সত্যেশ বলিল, ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে, তোমার আর আমার জীবনটা যেন এক সুতোয় গাঁথা। নইলে, এমন সব ব্যাপার ঘটে?

পিসিমা বাংলা জানেন না, বোঝেনও না।

লছমীয়া বলিল, আমারও তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু সুতোয় গাঁথার পক্ষে বাধা অনেক।

কেন?

একে আমি পিতৃমাতৃ পরিচয়হীন। শুনেছি, আমি বামুনের মেয়ে, এই পর্যন্ত। তারপর এখন পুরোপুরি খোট্টানি। কাজেই—

তাতে আর কি?

তাতে কি, কলকাতায় গিয়ে আপনার বাবা-মাকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন।

জিজ্ঞাসা নাইবা করলাম।

ওরে বাপ্, ভীষণ সাহস দেখি।

এই ধরণের কথা কিছুক্ষণ চলিতেছিল। ইতিমধ্যে তাহারা লক্ষ্য করিল পুলিশের লোক কয়েকখানি নৌকা লইয়া এইদিকে আসিতেছে।

নৌকায় চড়িয়া তাহারা কলিকাতায় ফিরিল।

৯

লছমীয়াকে বাড়ী ফিরিতে দেখিয়া লছমীয়ার পিতা হাতে স্বর্গ পাইলেন। বলিলেন, একটু আগে নন্দপুরা হইতে তার পাইয়াছেন, সেখানকার ভয়ানক অবস্থার কথা শুনিয়াছেন। তাঁহার পাশে ছিল একটি যুবক, নাম শ্যামলাল চৌবে। বিশাল বপু, বিরাট গোঁফ।

লছমীয়া সংক্ষেপে সত্যেশের পরিচয় দিয়া বলিল, এঁর জন্যই আমি বেঁচে গেছি। নইলে আমাকে আর তুমি দেখতে পেতে না।

লছমীয়ার পিতা আনন্দে বিহ্বল হইয়া সত্যেশকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। বলিলেন, আপনার উপকারের কথা আমি জীবনে ভুলবো না। তারপর বলিলেন, আসছে মাসেই লছমীয়ার বিয়ে এই শ্যামলালের সঙ্গে। আপনি আসবেন কিন্তু—

বিবাহের কথা কানে যাইতেই লছমীয়া জিভ কাটিয়া সুড়ুৎ করিয়া অন্দরমহলের দিকে চলিয়া গেল। পিসিমাও অনুগমন করিলেন।

সত্যেশ লছমীয়ার পিতাকে বলিল, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আসব।

তারপর তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া একটি ট্যাক্সিতে উঠিয়া পড়িল।

বাড়ী ফিরিলে পিসিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন এমন হ'ল? পথে কোন বিপদ-আপদ হয়নি তো? কই, তোর জিনিসপত্রগুলো গেল কোথায়? সঙ্গে যে কিছুই দেখছিনে। কোথায় ফেলে এলি?

না, এমন কিছু হয়নি। একটু বিশ্রাম করি। তারপর সব বলছি।

পিসিমা সব শুনিলেন। মা-বাবার কানে যাইতেও বাকি রহিল না। অবশেষে পিসিমা বলিলেন, খুব বেঁচে গেছিস বাপ্। এবার তাহলে মুখুজ্যেদের মেয়েটিকে দেখার ব্যবস্থা করি।

যা ইচ্ছে কর গে। আমি জানিনে কিছু।

আগস্ট, ১৯০৩

গণনা

১

হরিহর শর্মা প্রকাণ্ড জ্যোতিষী। তাঁহার গণনা নির্ভুল। জন্মের তারিখ ও সময় জানিতে পারিলে, তিনি যে-কোন ব্যক্তির ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সকল কথাই বলিয়া দিতে পারেন। যদি কেহ জন্মের সময় ঠিক না বলিতে পারে, তাহা হইলে শুধু তারিখ হইলেই চলে। যদি কাহারও তাহাও জানা না থাকে, তাহা হইলে কি বারে তাহার জন্ম, তাহা জানিতে পারিলেও তিনি সর্বপ্রকার গণনা করিয়া দিতে পারেন। যদি তাহাও জানা না থাকে, তাহা হইলে যে-কোন একটি ফল বা ফুলের নাম করিলেও তাঁহার গণনায় কোন বাধা থাকে না। সঙ্গে সঙ্গে হাতের রেখাও তিনি বিচার করেন এবং তাহা দেখিয়া বহু নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া থাকেন।

শ্যামল কাজ করে দত্ত দাস এণ্ড কোম্পানিতে। মাহিনা ভালই পায়। কোন বদখেয়াল নাই। তবে একটি মাত্র অভ্যাস আছে, সেটা হইতেছে, লটারিতে টিকিট কেনা। অবশ্য বেশী টাকার টিকিট নয়, অল্পস্বল্পই খরচ হয়। টিকিট কিনিয়া ফলাফলের আশায় দিনাতিপাত করা এবং অবশেষে হতাশ হওয়া, ইহাই যেন তাহার একটি মজ্জাগত অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিবাহ করিয়াছে প্রায় তিন বৎসর। স্ত্রীটি বেশ মনের মতোই হইয়াছে। চোখ-ঝলসানো সৌন্দর্য না থাকিলেও তাহাকে বেশ সুন্দরী-ই বলা চলে। দেহের সুন্দর গঠন ও নিটোল স্বাস্থ্য তাহার রূপকে কমনীয় করিয়া তুলিয়াছে। মাঝে মাঝে সুমিতার সঙ্গে শ্যামলের তর্ক হয়। সুমিতা বলে, কেন শুধু শুধু অমন করে পয়সা নষ্ট কর। তা ছাড়া, ফলাফল না জানা পর্যন্ত মনের একটা অশান্তি, তার পর হতাশায় কষ্ট। নিজের উপার্জনই ভাল। তাতেই সুখ। হঠাৎ পড়ে-পাওয়া টাকায় কি সুখ হয়?

শ্যামল বলে, কি জানি কেন, আমার কেমন একটা অভ্যাস হয়ে গেছে। এমনি এমনি হঠাৎ অনেকগুলো টাকা পাওয়া গেল, এটা ভাবতে বেশ লাগে।

—কিন্তু কেন তুমি অমন টাকার 'পরে লোভ করবে? আর এতদিন দেখতে তো পাচ্ছি, শুধু উদ্বেগ আর হতাশা ছাড়া কিছুই হচ্ছে না। যদিও কোনদিন হঠাৎ কিছু পাওয়া যায়, তাতে আমার একটুও আনন্দ হবে না। অমন লোভ করতে নেই।

শ্যামল বলে, আচ্ছা গো আচ্ছা, আর মাস্টারি করতে হবে না। মানুষের ভাগ্যই সব। ভাগ্যে যদি থাকে, তাহলে হয়তো একখানা একটাকার টিকিটেই ভাগ্য ফিরে যাবে। তখন আর লটারিতে তোমার আপত্তি থাকবে না।

—নিশ্চয়ই থাকবে। ও কাজটাকেই আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি। কেন যে তুমি এটা বোঝ না, আমি ধারণা করতে পারি না। এমনি করেই লোকে রেস-খেলা আরম্ভ করে, আবার আরো কতরকম জুয়াখেলার ঝোঁক এসে পড়ে। খেলার ছলে কখনো একখানা টিকিট কিনলে, সেটা আলাদা কথা। তার কথা মনেও থাকে না, কোন উদ্বেগও হয় না, টাকা এল কি না-এল, তা নিয়ে অশান্তি হয় না। কিন্তু অনবরত খালি ওই নিয়ে থাকা, ওটা অত্যন্ত খারাপ অভ্যাস। সত্যি, তুমি ক্রমে ক্রমে ওটা ছেড়ে দাও।

—আচ্ছা, দেখা যাবে।

শ্যামল সুমিতার অনুরোধে ও শাসনে লটারির টিকিট কেনা অনেক কমাইয়া দিয়াছে। কিন্তু অভ্যাসটা একেবারে ছাড়িতে পারে নাই।

একদিন তাহার অফিসের আর একজন কর্মচারী একখানি লটারির টিকিটের বই আনিয়া তাহার সম্মুখে ধরিতেই শ্যামল বলিল, না ভাই, আমি আর এটার টিকিট কিনব না।

—সে কি হয়? তোমার ভরসাতেই আমি বইখানা নিয়ে এলুম। তুমিই বউনি করবে।

শ্যামল আপত্তি করিল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত একখানা টিকিট কিনিয়া ফেলিল।

যিনি টিকিট বিক্রয় করিলেন, তিনি বিশেষ জোর করিয়াই বলিয়া গেলেন, শ্যামল অত্যন্ত 'লাকী', এবার নির্ঘাত জয়।

বাড়ি আসিয়া ভয়ে ভয়ে সুমিতার নিকট টিকিটের কথা বলিতেই সুমিতা বলিয়া উঠিল, আবার টিকিট কিনেছ?

—অনেকদিন পরে। অফিসের এক বন্ধু গতিয়ে দিল। এড়াতে পারলুম না।

—লোক বুঝেই গতায়।

—বোধ হয় এই আমার শেষ টিকিট।

—দেখা যাবে।

শ্যামল একটু বিশ্রাম করিল। তারপর জামা-কাপড় পরিয়া বাহিরে যাইবার জন্য উদ্যত হইল। সুমিতা বলিল, এই অফিস থেকে এলে, আবার কোথায় বেরুচ্ছ?

একটু গদাধর শর্মার ওখানে যাব।

—আবার জ্যোতিষী ? যত সব—

—কি যে বল ? গদাধর পণ্ডিত খুব বড় জ্যোতিষী, সবার সব কথা ঠিক-ঠিক বলে দিতে পারেন।

—কি জিজ্ঞেস করতে যাবে তুমি ?

—এই—মানে—এই টিকিটের ফলাফল।

—তোমাকে নিয়ে আর আমি পারিনে ! অবসর সময়ে একটু পড়াশোনা কর, না-হয় কোন ভাল সভা-সমিতিতে যাও। তাও ভাল না লাগে, অগত্যা না-হয় আমার সঙ্গেই একটু ফষ্টিনষ্টি কর। তা তো না, যত সব বুজরুকি, তাই নিয়ে সময় নষ্ট। জ্যোতিষী যা হয় কি একটা বলে দেবে, আর তাই নিয়ে বসে বসে ভাববে। কি যে এক বাতিক জুটিয়েছ, বলতে পারিনে বাপু !

—এই আমি এলুম বলে। দেখ তো, মনিব্যাগে টাকা আছে নাকি ? যদি না থাকে, দু-তিনটে টাকা দিয়ে দাও। পণ্ডিতমশায়কে কিছু দক্ষিণা বা প্রণামী দিতে হবে।

—তা দিচ্ছি। কিন্তু আমি বলছি, তোমার এসব বাতিক ছাড়তে হবে।

—আচ্ছা আচ্ছা, ক্রমে ক্রমে হবে। তোমার হাতে যখন পড়েছি—

—আহাা-হা ! আমার হাতে উনি পড়েছেন ? কত আমার বাধ্য তা আমার আর জানতে বাকি নেই।

—কেন, কখন কিসে তোমার অবাধ্য হলাম ? তোমার অনুমতি ছাড়া আমি কিছু করে থাকি ?

—যাও ! আর আদিখ্যেতা করতে হবে না।

২

জ্যোতিষী গদাধর পণ্ডিতের নিকট গিয়া শ্যামল তাহার হাত দেখাইল এবং লটারির টিকিটের কথা বলিয়া উহার ফলাফলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিল। পণ্ডিত-মহাশয় খানিকক্ষণ চিন্তা করিলেন, কাগজ-পেন্সিল লইয়া একটু লেখাপড়াও করিলেন। পরে গম্ভীরভাবে বলিলেন, লটারির টিকিটের ফলাফল ঠিক বোঝা গেল না, তবে দুইমাস পরে ধনপ্রাপ্তি যোগ আছে। শ্যামল হিসাব করিয়া দেখিল, লটারির ফল প্রকাশিত হইতে ঠিক দুইমাসই বাকি আছে। সুতরাং ওটা যে লটারির-ই ফল, সে বিষয়ে তাহার মনে আর সন্দেহ রহিল না। কিন্তু ধনপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আর

যে একটি ফলের কথা পণ্ডিতমহাশয় বলিলেন, তাহা শুনিয়া শ্যামলের মুখ শুকাইয়া গেল। পণ্ডিতমহাশয় বলিলেন, আপনার স্ত্রীর একটা বড়রকম ফাঁড়া আছে দুই মাস পরে। বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক। আর, শনির কোপ নিবারণার্থ আমাকেও একটা শনিতোষ যজ্ঞ করতে হবে, তার জন্য সাতচল্লিশ টাকা সাড়ে এগারো আনা অর্থাৎ সাতচল্লিশ টাকা বাহাত্তর নয়া পয়সা লাগবে। এটা অবশ্য আপনার জন্যই। অন্য লোক হলে ঠিক এর দ্বিগুণ লাগত।

—টাকা এখন আমার কাছে নেই যে?

—তা, দিয়ে যাবেন কাল সকালে।

শ্যামল ভীত ও উদ্বিগ্নচিত্তে বলিল, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। অফিস যাবার পথে আপনার টাকাটা নিশ্চয়ই দিয়ে যাব। যজ্ঞের সব ব্যবস্থা আপনিই করবেন।

—নিশ্চয়ই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন। তবে সব বিষয়ে একটু সাবধানে থাকতে বলবেন আপনার স্ত্রীকে। শনির কোপ, কোন্ দিক্ দিয়ে কি হয় বলা তো যায় না। তবে হ্যাঁ, যজ্ঞফল ঠিকই ফলবে।

পরদিন যথাসময়ে শ্যামল জ্যোতিষীমহাশয়ের টাকা দিয়া অফিসে গেল। এতগুলি টাকা অপব্যয় হইল দেখিয়া সুমিতা অত্যন্ত চটিয়া গেল। কিন্তু কি আর করিবে? শ্যামলের এ বাতিক যতদিন আছে, ততদিন এরকম অত্যাচার' সহিতেই হইবে। তবে পূর্বের চেয়ে বাতিকটা একটু কমিয়াছে বলিয়া মনে হয়। যদি ক্রমশঃ বাতিকটা ছাড়িয়া যায়, এই আশাই সুমিতা করিতেছে।

শ্যামল তাহার লটারি দ্বারা ধনপ্রাপ্তির সম্বন্ধে জ্যোতিষীমহাশয় যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন, তাহা সুমিতাকে বলিয়াছে। কিন্তু তাহার ফাঁড়া সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, সে কথা সুমিতাকে বলে নাই। এ কথা শুনিলে হয়তো সুমিতা উদ্বিগ্ন হইবে। মানসিক অবসাদ হইতে আবার কোন অসুখ-বিসুখ করিয়া বসিতে পারে, এই সকল কথা মনে করিয়া শ্যামল সুমিতার ফাঁড়ার কথাটা একেবারে চাপিয়া গেল। সুমিতাকে কিছু না বলিলেও তাহার নিজের মনের উদ্বেগ কেমন করিয়া রোধ করিবে? সে ভাবিতে লাগিল, তাই তো, দুই মাসের মধ্যে কি এমন ফাঁড়া আছে? এমন স্বাস্থ্য, হঠাৎ কি হইতে পারে? কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড সবই হইতে পারে। পথে মোটরগাড়ির তলায় পড়িয়া যাইতে পারে। সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময়ে হঠাৎ পড়িয়া যাইতে পারে। কি না হইতে পারে? দৈব যদি প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে সবই সম্ভব। যাহা হউক, এ দুইমাস সুমিতাকে অত্যন্ত সাবধানে রাখিতে হইবে। তাহার আহারাদি, তাহার চলা-ফেরা, তাহার বাড়ির বাহিরে

কোথাও যাওয়া-আসা প্রভৃতি সকল বিষয়েই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। দুইটা মাস! সোজা কথা নয়। ষাট দিন! এই ষাট দিনের মধ্যে কি না হইতে পারে? শ্যামল শুধুই ভাবিতে লাগিল। এই দুইমাস নিরাপদে কাটিবে তো? শনিযজ্ঞের কি কোন ফল হইবে না? উঃ, এই দুইমাসের মধ্যেই কি তাহার এই চারবৎসরের সুখের নীড় ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে? আর সুমিতা! আহা, এই সরলা অবলা, সদাহাস্যময়ী সুমিতা, আমারই এই সুমিতা, এই সুমিতার জীবনে এমন কি একটা ধাক্কা আসিবে? সে ধাক্কা সে সহিতে পারিবে কি? যদি না পারে? তাহা হইলে কি হইবে? আমার সুমিতা কি আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে? যাইতে পারিবে কি সে? যদি তাই হয়, আমি বাঁচিব কেমন করিয়া? সুমিতাবিহীন শ্যামল— সে যে একেবারেই অসম্ভব! অসম্ভব! অসম্ভব! ওঃ। শ্যামল ভাবিয়া ভাবিয়া কোন কূলকিনারা পায় না। দুইমাসের মধ্যে তাহার সাধের জীবনতরণী কি ঝঞ্ঝাঘাতে ডুবিয়া যাইবে? জ্যোতিষীর কথা কি একেবারেই ভুল হইতে পারে? কখনই না। তবে হ্যাঁ, শনিযজ্ঞের ফল হয়তো শুভ। কিন্তু তাহারই বা স্থিরতা কি?

ভাবিতে ভাবিতে শ্যামল ভীষণ গম্ভীর হইয়া গেল। মুখে হাসি নাই। কখনও কোন বাজে কথা নাই। কোনরূপে নিয়মিত কাজগুলি করিয়া যায় আর সুমিতার দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখে। কখনও কোন দুর্ঘটনায় যেন না পড়ে, কোনপ্রকার অখাদ্য যেন না খায়, শরীরের প্রতি কোন অত্যাচার না করে। এমনি করিয়া দিবারাত্র উদ্বিগ্নচিত্তে শ্যামল সুমিতাকে তাহার সতর্ক দৃষ্টি ও কঠোর উপদেশ দিয়া ঘিরিয়া রাখে।

সুমিতা বলে, তোমার হ'ল কি? দিনরাত আমার পিছনে লেগেছ কেন বল তো? বাড়ির লোকে দেখেশুনে কি মনে করছে? অত বাড়াবাড়ি কি ভাল?

শ্যামল দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলে, কই, কি আর করছি? তোমার জন্য একটু ভাবব না, তবে কার জন্য ভাবব?

—আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে! তাই বলে অমন করে পিছনে লাগলে আমি সবার কাছে মুখ দেখাব কেমন করে?

—আচ্ছা, লাগব না পিছনে। তবে, সব বিষয়েই একটু সাবধানে থাকাই ভাল নয় কি?

—নিশ্চয়ই। তা বলে সব সময়ে অমন ট্যাক-ট্যাক কোরো না।

শ্যামল প্রকাণ্ড একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। আর মনে মনে বলে, আমার যে কী ভাবনা, সে তুমি কেমন করে বুঝবে? অহরহ আমার বুকের মধ্যে যে চিন্তা, কী উদ্বেগ চেপে বসে রয়েছে, তা তুমি কেমন করে জানবে, সুমিতা!

শ্যামলের এই উদ্বিগ্ন মন সুমিতাকেও উদ্বিগ্ন করিয়া তোলে। সেও মনে মনে ভাবে, কি হ'ল ওর? হঠাৎ কেন এত গম্ভীর হয়ে গেলেন। লটারির ভাবনা? কিন্তু সেজন্য উনি আমার জন্য কেন বিব্রত বোধ করেন? লটারির সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?

শ্যামল কেবলই চিন্তা করে, দু'টো মাস কি আর কাটবে না? কত দিন, কত সপ্তাহ, কত মাস, কত বছর ফসফস করে বেরিয়ে গেল. অথচ এই দু'টো মাস যেন কাটছেই না।

একদিন অভিমানভরে ছলছল চোখে সুমিতা শ্যামলকে বলিল, তোমার এ দীর্ঘশ্বাস আমি আর সইতে পারছিনে। কি হয়েছে, আমাকে বলতেই হবে। অফিসের কোন টাইপিস্ট বা অন্য কোন মেয়ের সঙ্গে আলাপ-টালাপ হয়েছে বুঝি? কিম্বা ব্যাপারটা আরও এগিয়ে কোন বিশ্রী পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে? আমাকে আর ভাল লাগছে না? না, দোটানায় পড়ে ছটফট করছ? কি হয়েছে, বল না? •

শ্যামল অসহিষ্ণু হইয়া বলে, কী যা-তা বলছ তুমি? ওসব কল্পনা মনেও এনো না। তুমি আমার সুমিতা, আমি তোমার শ্যামল, এর মধ্যে কোন ফাঁক নেই। অবান্তর চিন্তা মনে এনো না। নাও, এখন যাও, রেডিওটা খুলে একটু গান-টান শোন গে। মনে যা-তা উদ্বেগ করে শরীর খারাপ কোরো না। শরীরের সঙ্গে মনের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, বুঝলে? মন খারাপ হ'লে শরীরও খারাপ হবে। শরীর আর মনের বিষয়ে খুব সাবধানে থাকবে, বুঝলে?

—তা থাকব। কিন্তু তুমি আমার শরীর মন নিয়ে কেন হঠাৎ অস্থির হয়েছ, তা কিন্তু আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে। তুমি বোধ হয় ভেবেছ—, সে সব কিছু নয়। আমি বেশ ভালই আছি। আর যদি হসই. সে তো আহ্লাদের কথা। এত দুশ্চিন্তা কিসের?

—না না, সে সব আমি ভাবিনি। তবু দিনকাল ভাল নয়। তাই বলি, খুব সাবধানে থেকো।

—আবার সেই কথা! যাক, আমি বলছি, সাবধানে থাকব। হ'ল তো?

৩

একদিন সন্ধ্যার সময়ে শ্যামল অফিস হইতে ফিরিয়া বিশ্রাম করিতেছে, সুমিতা পাশে বসিয়া একটি চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতেছে। শ্যামল বলিল, সুমি!

—কি, বল।

—আমার ব্যাগের মধ্যে একটা প্যাকেট আছে, নিয়ে এস।

সুমিতা প্যাকেটটি আনিয়া শ্যামলের হাতে দিল। শ্যামল আস্তে আস্তে প্যাকেটটি খুলিয়া একটি চেপ্‌টা ভেলভেটের বাক্স হইতে একটি জড়োয়া হার বাহির করিয়া সুমতির গলায় পরাইয়া দিয়া বলিল, যাও, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখ তো, প্যাটার্নটা কেমন হয়েছে?

সুমিতা সেখানে বসিয়াই বুকের দিকে একটু চাহিয়া বলিল, চমৎকার হয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা কি? এত টাকা কোথায় পেলে?

—ধার করলুম।

সুমিতা কপালে চোখ তুলিয়া প্রায় আর্তনাদ করিয়া উঠিল, ধার করলে? কি সর্বনাশ। আজকালকার দিনে কেন তুমি এ কাজ করতে গেলে?

—লটারির টাকা পেলেই শোধ করে দেব।

—যদি না পাও?

—নিশ্চয়ই পাব। জ্যোতিষীর গণনা নির্ভুল। ধনপ্রাপ্তি মানে লটারির টাকা পাওয়া ছাড়া আর কি হবে? কি হতে পারে?

—তাই, টাকা পাওয়া পর্যন্ত আর তর সইল না। আমি পরব না এ-হার। তুমি কালই এ হার ফিরিয়ে দিয়ে এস।

—এটা সেলে কেনা, এ হার ফেরত নেবে না। তা ছাড়া, কেনই বা ফেরত দেব? আর মাস-দেড়েক বই তো নয়। লটারির টাকাটা পেলেই এর দাম শোধ হবে, তার উপরেও কিছু হাতে থাকবে।

সুমিতা বলে, উঃ, কী বাতিকে যে পেয়েছে তোমায়! এ একটা রোগ-বিশেষ। কবে তুমি এ জ্যোতিষ-চর্চা ছাড়বে আমাকে বল। নইলে—

সুমিতা প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল।

শ্যামল সুমিতার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল এবং বলিল, আচ্ছা, এই আমার শেষ লটারির টিকিট। আর কখনো কিনব না।

—এ কথা তুমি আগেও আমাকে বলেছ। তা ছাড়া শুধু লটারির টিকিট নয়, তার পরে আবার জ্যোতিষের প্রলেপ। একে মনসা, তায় আবার ধুনোর গন্ধ! এমন করতে করতে কোন্‌দিন তুমি পাগল হয়ে যাবে। আর সঙ্গে সঙ্গে আমিও—

সুমিতা প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল।

শ্যামল তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, সত্যি বলছি, আমি আর টিকিট-ফিকিট কিনব না।

—কিন্তু হারের কি হবে?

—যেখানে আছে, ওখানেই থাকবে।

—ধারের টাকার কি হবে?

—লটারির টাকা থেকে শোধ হবে।

—আবার সেই লটারির টাকা আর সেই জ্যোতিষ!

শ্যামল বলিল, আবার ভাবতে বসলে? বলেছি না, ভাবনায় শরীর খারাপ হয়। যাও, রেডিওর চাবিটা খুলে একটু গান-টান শোন গে।

কয়েকদিন পরে।

সুমিতা সাজিয়া-গুজিয়া শ্যামলকে বলিল, দিদির সঙ্গে একটু সিনেমায় যাচ্ছি। কতদিন যাইনি।

—না গেলেই ভাল হ'ত না?

—কেন?

—দেখছ-না কাগজে, প্রায়ই নানারকম অ্যাক্‌সিডেণ্ট হচ্ছে। কিছুদিন না-হয় একটু সাবধানেই থাকলে।

—সাবধানেই তো রয়েছি। তাই বলে বাড়ি থেকে একটু বেরুবো না?

—তা কেন বেরুবে না। কোনদিন বারণ করেছি? মানে দিনকাল ভাল নয় কিনা। বাসে, ট্রামে, মোটরে, রিক্‌শায়, এমন কি শুধু ফুটপাতেও হরদম কত অ্যাক্‌সিডেণ্ট হচ্ছে। তাই বলছিলাম, কিছুদিন একটু সাবধানে থাকলেই ভাল হ'ত।

সুমিতা বলিল, আমাদের টিকিট কেনা হয়ে গেছে। এখন আর বাগড়া দিও না। সিনেমা থেকে ফিরে এসে আবার সাবধানে থাকতে আরম্ভ করব।

দিদির সহিত ট্রামে যাইতে যাইতে সুমিতা বলিয়া ফেলিল, কি যে হয়েছে কিছুদিন থেকে, কেবল আমাকে সাবধান করে নিয়ে বেড়াচ্ছেন। আর সর্বদাই কি যেন ভাবেন, আমাকে দেখলেই ওঁর ভাবনা যেন বেড়ে ওঠে।

দিদি হাসিয়া বলিলেন, ওরকম হয়ে থাকে। যাক-না আর দু-একটা বছর। সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

আরো কিছুদিন পরে। সুমিতার দাদার ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণ

আসিয়াছে। সুমিতা শ্যামলকে বলিয়া একটা বড় ডল্ কিনিয়াছে। সন্ধ্যার সময় যখন তাহারা যাত্রা করিবে, তখন শ্যামল হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, আচ্ছা, তোমরা কি না-গেলেই নয় ?

—সে আবার কি ! দাদার ছেলের ভাত, অথচ আমি যাব না, এর মানে কি ?

—না, মানে, সময়টা ভাল না কিনা। নেমন্তন্ন খেয়ে-টেয়ে হঠাৎ অসুখ-বিসুখ না করে।

—কি আশ্চর্য। কী যা-তা ভাবছ। তুমি কি জান না, খাওয়ার বেলায় আমি কত সাবধান ? এত লোক খাবে, তাদের কারও কিছু হবে না, শুধু আমারই অসুখ হবে ?

শ্যামল ঢোক গিলিয়া বলিল, মানে, সময়টা ভাল না কিনা। চারিদিকে কত অসুখ-বিসুখ হচ্ছে, তাই একটু ভাবনা হয় না ?

—তোমাকে আর ভাবতে হবে না। এস, ক্রমশঃ রাত হয়ে যাচ্ছে।

শ্যামল অগত্যা চলিল সুমিতার সঙ্গে। পথে কেবলই ভাবিতে লাগিল, হে ভগবান, হে শনিনিসূদন, এই নিমন্ত্রণের ফাঁড়াটা কাটিয়ে দিযো !

ফাঁড়া নির্বিঘ্নে কাটিয়া গেল। কিন্তু শ্যামলের দুশ্চিন্তা কাটিল কই ? মাত্র দেড়মাস হইয়াছে। আরো পনরো দিন বাকি। এই পনরো দিন কাটে তবে তো ! চিন্তায়, ভাবনায়, উদ্বেগে শ্যামলের শরীর ও মন ক্রমশঃই দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। আহারে রুচি নাই। সুমিতাকে সামনে দেখিলেই খাবার যেন তাহার গলায় বাধিয়া যায়। সুমিতাও ক্রমশঃ ভীত হইয়া পড়িল। শ্যামলের কোন কঠিন অসুখের পূর্ব-লক্ষণ নয় তো ? অথচ সে-কথা বলতে পারে না। বলিতে গেলে অসুখের উপসর্গ আবার বাড়িয়াও যাইতে পারে।

একদিন শ্যামল লক্ষ্য করিল, সুমিতার কপালের ডানদিকে ছোট্ট একটা ফুস্‌কুড়ি হইয়াছে। প্রায় একটা ঘামাচির মতো, তবে ঘামাচি নয়। দেখিয়াই শ্যামল অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া সুমিতাকে বলিল, দেখ, খুব সাবধান ! ফুসকুড়িটায় হাত দিয়োনা যেন। আমি আজই ডাক্তারকে খবর দিচ্ছি।

—কি যে বল ! একটা ফুসকুড়ি হয়েছে, দু'দিন-তিনদিন পরেই সেরে যাবে। আমার ইচ্ছে করছে এখনই গেলে দিই।

—খবরদার ! অমন কাজও কোরো না। সময়টা মোটেই ভাল নয়। দেখছ একটা সামান্য ফুসকুড়ি। ও থেকে কি না হ'তে পারে ? ফোড়া হ'তে পারে, কারবাঙ্কল

হ'তে পারে, গ্যাংগ্রীন হ'তে পারে, সেলুলাইটিস হ'তে পারে, ইরিসিপেলাস হ'তে পারে, ফিস্‌চুলা হ'তে পাবে, ক্যানসার হ'তে পারে। আমি ডাক্তারকে খবর দিচ্ছি। তুমি খুব সাবধান! হাত-টাত দিয়োনা।• ত্ব-চারদিন তেলমাখা, স্নানকরা বন্ধ কর।

সুমিতা কি বলিবে ভাবিয়া পায না। তবু বলে, হ্যাঁ, আমি খুব সাবধানে থাকবো, তুমি ভেবো না।

শ্যামল কিন্তু রীতিমতো ভাবিতেছে। এমনি করিযাই কি গণকের কথা ফলিযা যাইবে? সে ডাক্তার ষডানন চাটুজ্যেকে কল দিল। ডাঃ চ্যাটার্জী আসিলেন। রোগী এবং রোগ দেখিলেন। অতিকষ্টে হাসি চাপিযা একটা প্রেসক্রিপশন করিয়া দিলেন এবং ফী লইযা বলিযা গেলেন, বেশী ভাববেন না আপনারা। তিন-চারদিন পরে আমাকে খবর দেবেন।

খবর অবশ্য দিতে হইল না। দুইদিনেই ফুসকুড়িটা অদৃশ্য হইযা গেল। সুমিতা বলিল, শুধু শুধু অতগুলো টাকা ডাক্তারকে দিলে।

—শুধু শুধু নয, সুমিতা। সমযটা ভাল নয় কিনা? সাবধানের মার নেই।

৪

এমনি করিযা দিন কাটিতেছে। সুমিতা শ্যামলকে বলে, শুধু ভেবে ভেবে নিজের শরীর মন এমন করে কেন নষ্ট করছ? খাওযা নেই, ঘুম নেই, খালি আমার জন্য যা-তা ভাবনা। তুমি তো এমন ছিলে না! হাসি নেই, আনন্দ নেই, কেবল সাবধান আর সাবধান!

শ্যামল বলে, তুমি ঠিক বুঝবে না। মানে, দেখছ না, চারদিকে নানারকম অসুখ-বিসুখ, কখন কার কি হয় বলা যায কি? সমযটা মোটেই ভাল নয়।

যাহা হউক, গণকের নির্দিষ্ট দুইমাস শেষ হইতে চলিযাছে। আজ ঠিক দুইমাস পূর্ণ হইবে। যদি আজকার দিনটা ভালয়-ভালয কাটে, তাহা হইলে কাল হইতে শ্যামলের আর দুশ্চিন্তা থাকিবে না। কিন্তু আজকার দিনটা কাটিবে কি?

শ্যামল আজ ক্যাজুয়াল লীভ লইযাছে। তাহার ভাবনা সত্যই আজ চরমে উঠিয়াছে। আরো চব্বিশটা ঘণ্টা সে সুস্থমস্তিকে থাকিতে পারিবে কি?

সুমিতা স্নানের ঘর হইতে আসিয়া বলিল, এই দেখ, তোমার গণকের কথা কিন্তু সত্য হয়ে গেছে।

শ্যামল চমকাইযা উঠিল। কি ব্যাপার?

—আজ তোমার ধনপ্রাপ্তি হয়েছে।

—লটারির খবর এসেছে বুঝি ? কই চিঠি দেখি ?

—চিঠি নয়। তোমার ধন আমার হাতের মুঠোর মধ্যে।

শ্যামল ব্যস্ত ত্রস্ত হইয়া বলিল, হেঁয়ালি রাখ। বল, কি হয়েছে ?

—এই দেখ, বলিয়া সুমিতা হাত খুলিয়া দেখাইল।

শ্যামল সবিস্ময়ে দেখিল, একটি নয়া পয়সা।

সুমিতা বলিল, বাথরুমের ড্রেনের পাশে পড়ে ছিল। যাই হোক, তোমার জ্যোতিষীর গণনা সার্থক হয়েছে, কি বল ?

শ্যামল কোন উত্তর দিল না। মনে করিল, ধনপ্রাপ্তি মানেই যে বহুধনপ্রাপ্তি, তা না হইতে পারে। একটি নয়া পয়সা কি ধন নয় ? জ্যোতিষগণনা ব্যর্থ হইবার নয়।

দিনটা কোনমতে কাটিয়া গেল! সন্ধ্যার পর শ্যামল একটু বাহির হইয়া গিয়া অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিল। সে আজ সুমিতাকে চোখের আড়াল করিতে পারে না। তাহার ছোট বোনটিও ইহা লক্ষ্য করিয়াছে। সেও একটু একটু হাসিতেছে আর ভাবিতেছে, দাদার হ'ল কি ?

রাত্রে আহারাদির পর শ্যামল ও সুমিতা শয়ন করিয়াছে। একটু পরেই সুমিতা ঘুমাইয়া পড়িল। শ্যামলের চোখে ঘুম নাই। সে ভাবিতেছে আরও পুরা আট ঘণ্টা বাকি। এই রাত্রিটা নির্বিঘ্নে কাটিলে হয়। এক এক বার সুমিতার দিকে চাহিতেছে, আর দুশ্চিন্তায় তাহার মুখ যেন বিবর্ণ হইয়া উঠিতেছে। ছোট বেড্রুম-ল্যাম্পটা জ্বালাই ছিল। বেড্সুইচটা ধরিয়া নিভাইতে গিয়াও নিভাইল না। না, থাক আজ আলোটা জ্বালা। ছোট্ট আলো, জ্বলুক-না একটা রাত।

দেওয়ালের গায়ে ঘড়ি টিকটিক করিতেছে, অস্পষ্ট আলোয় দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলি দেখা যাইতেছে। বাহিরে মাঝে মাঝে রাস্তায় গাড়ি যাওয়ার শব্দ শোনা যাইতেছে। মাঝে মাঝে জানালা দিয়া এক এক ঝলক বাতাস ঢুকিয়া মশারিটাকে দোল দিতেছে—আর, শ্যামল বিনিদ্র চোখে সুমিতার দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। ফাঁড়াটা কাটিবে তো! উঃ, যদি কিছু অঘটন ঘটিয়া যায়!

ঘড়িতে টং-টং করিয়া দুইটা বাজিল। শ্যামল অতি সন্তর্পণে বালিশের পাশ হইতে একটি সাদা কার্ডবোর্ডের ছোট্ট একটা বাক্স হাতে লইয়া ধীরে সুমিতার গা ঘেঁষিয়া বসিয়া সুমিতার গা একটু ঠেলিয়া তাহাকে জাগাইল। সুমিতা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, একি! তুমি এখনও ঘুমোওনি।

শ্যামল সে-কথায় কোন উত্তর না দিয়া প্রায় ধরা গলায় গাঢ়স্বরে বলিল, সুমিতা!

সুমিতা ঘুম-বিজড়িত চোখেও একটু না হাসিয়া পারিল না। বলিল, কোন নূতন কথা আছে নাকি?

—শোন সুমিতা, তুমি কড়াপাকের সন্দেশ খেতে এত ভালবাস। অনেকদিন তুমি কড়াপাকের সন্দেশ খাওনি। তাই—

এই কথা বলিয়াই শ্যামল কাগজের বাক্স খুলিয়া সুমিতার সামনে ধরিয়া বলিল, নাও লক্ষীটি—

সুমিতা হাসিবে না কাঁদিবে, বুঝিতে না পারিয়া স্থির হইয়া রহিল। পরক্ষণে বলিল, তুমি ক্রমেই ছেলেমানুষ হচ্ছ বুঝি? রাত দুটোর সময়ে মশারির মধ্যে বসে কড়াপাকের সন্দেশ খাবার মানে কি?

—মানে তুমি বুঝবে না। তুমি খেতে থাক, আমি এখুনি জলের গ্লাস নিয়ে আসছি। এক কামড় সন্দেশ খাবে আর এক চুমুক জল খাবে। নচেৎ শুকনো সন্দেশ গলায় বেধে একটা অনর্থ না হয়।

এই রাত্রে বিছানায় বসিয়া তর্কাতর্কি করা শোভন নয়। সুমিতা একটি সন্দেশ খাইয়া, খানিকটা জল খাইয়া শুইয়া পড়িল। বলিল, আমার ভয়ানক ঘুম পাচ্ছে। ডেকো-টেকো না কিন্তু—

সুমিতা একটু পরেই ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু শ্যামলের চোখে ঘুম আসে না। সে ঘড়ির টিকটিক শব্দ শুনিতেছে আর ভাবিতেছে, আর তিনটে ঘণ্টা কাটিলে হয়। সে নির্নিমেষ চোখে সুমিতার দিকে চাহিয়া আছে এবং মাঝে মাঝে তাহার হাতের আঙুল নাকের গোড়ায় লইয়া গিয়া দেখিতেছে, নিঃশ্বাস বহিতেছে কিনা।

এমনি করিয়া রাত কাটিল। জানালা দিয়া প্রভাতের আলো আসিয়া পড়িল। সুমিতার ঘুম ভাঙিল। বলিল, কি আশ্চর্য! তুমি এখনও বসে আছ?

—হ্যাঁ, সুমিতা! এস, একটু কাছে এস।

—যাও! আচ্ছা, এর মানে কি?

—আজ আর তোমাকে মানে বলতে বাধা নেই। জ্যোতিষী বলেছিল, দু-মাসের মধ্যে তোমার একটা সাংঘাতিক ফাঁড়া আছে। আজ সকালে দু'মাস শেষ হ'ল।

—ও! তাইতো বলি, কেন তুমি আমাকে দিনরাত সাবধান করে নিয়ে বেড়াচ্ছিলে! তাহলে ফাঁড়াটা ফুসকুড়ির ভিতর দিয়েই কেটে গেল। কি বল?

প্রেম ও মশা

লেকের দক্ষিণ দিকের আমবাগান।

সন্ধ্যা হইয়াছে। আবছা অন্ধকার নামিয়াছে। মানুষ দেখা যায়, কিন্তু চেনা যায় না। লেকের জল স্থির হইয়া আছে। মাঝখানে দ্বীপের উপর গাছের ঝোপ স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। আকাশ নির্মেঘ, কিন্তু চাঁদ নাই। এই সুযোগে তারাগুলি খুব খুশী হইযা হাসিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাতাস প্রায় বহিতেছে না বলিলেই হয়। গাছের ডগায় কোথাও কিঞ্চিৎ স্পন্দন ছাড়া আর কোন চঞ্চলতা নাই।

একখানি বেঞ্চের একপাশে বসিযা আছে নীরা। বয়স আঠার। পাতলা ছিপছিপে মানুষ। পাযে রঙীন স্যাণ্ডাল, হাতে একটি ছোট গোল ব্যাগ। পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্নতা আছে, বাহুল্য নাই। মুখে একটা ব্যাকুলতার ছাপ। কাহার জন্য যেন প্রতীক্ষা করিতেছে। মাঝে মাঝে হাতঘড়িটি চোখের কাছে আনিয়া সময় দেখিতেছে।

এই বেঞ্চেরই অপর প্রান্তে বসিয়া আছে অবনী। ধুতি-পাঞ্জাবি-চশমা-ঘড়িতে বেশ মানাইযাছে। মাঝারি দোহারা চেহারা। বযস চব্বিশ। মুখখানি প্রশান্ত, ঈষৎ গম্ভীর। চোখ দু'টি চারিদিকে ঘুরিতেছে। কখনো জলের দিকে, কখন গাছের দিকে, কখনো আকাশের দিকে, আবার কখনো [illegible]দিকের পথের দিকে। সম্ভবত অবনীও কাহার পথ চাহিয়া কাল গণিতেছে!

ঠাস্। উঃ!

নীরা তাহার ডান পায়ের গোড়ালির কাছে একটা চড় মারিল। মশা বোধ হয় উড়িযা গেল। নীরা বিরক্ত হইয়া শাড়ীটা আর একটু নীচের দিকে টানিয়া নিযা চুপ করিয়া বসিল এবং প্রকাণ্ড একটা হাই তুলিল।

উঃ!

অবনী কানের কাছে শোঁ-শোঁ শব্দ শুনিয়া বিরক্ত হইয়া মাথায় একটি ঝাঁকানি দিয়া আবার স্থির হইয়া বসিল এবং রুমাল বাহির করিযা কানের পাশ ও কাঁধ ভাল করিয়া ঝাড়িয়া ফেলিল।

কিছুক্ষণ একেবারে চুপ।

তারপর অবনী নীরার দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল, আমার জন্য কি আপনার কোন অসুবিধে হচ্ছে?

না; মোটেই না। কিন্তু দেখুন না, কি ভীষণ মশা!

ঠাস্, উ-হু-হু!

নীরা নিজের ডান গালে একটি বড় চড় বসাইয়া দিল। হাত তুলিয়া দেখিল একটি রক্তাক্ত মশা হাতে লাগিয়া আছে। ব্যাগের ভিতর হইতে রুমাল বাহির করিয়া হাত ও গাল মুছিয়া ফেলিল। বলিল, আমার জন্য আপনার নিশ্চয়ই খুব অসুবিধে হচ্ছে?

না, না, কিছু না। মানে, আমি আমার একটি বান্ধবীর জন্য অপেক্ষা করছি। ঠিক এইখানেই আসবার কথা। তিনি এলেই আমরা এখান থেকে—

নীরা বলিল, আমারও সেই একই কথা। আমার একটি বন্ধু, বিশেষ বন্ধু, ঠিক এইখানেই এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন, বলেছেন। তিনি এলেই আমরা এখান থেকে চলে যাব।

ঠাস্, উ-হু-হু-হু!

অবনী তাহার বাঁ পায়ে একটা চড় মারিয়া কোঁচার কাপড় আর একটু ঝুলাইয়া পা দু'খানি ঢাকিয়া স্থির হইয়া বসিল।

এমনি করিয়া সময় কাটিতে লাগিল। মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখা, কখনো কখনো মশা তাড়ান, কখনো পথের দিকে তাকান, কখনো একটা দীর্ঘশ্বাস, কখনো পরস্পরের দিকে চাহিয়া দু' একটা কথা। কী আশ্চর্য! বন্ধু বা বান্ধবীর আসিবার কোন চিহ্নই নাই। পথে লোক চলাচলও প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে।

রাত্রি বাড়িতে লাগিল, অন্ধকার গাঢ় হইতে লাগিল। ঝিঁঝি পোকার ডাক শোনা যাইতে লাগিল। দুই জনই অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ করিতে লাগিল।

নীরা বলিল, দেখুন তো কি অন্যায়!

অবনী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, আপনিও দেখুন, কী ভীষণ অন্যায়!

—আমার মনে হয়, আর অপেক্ষা করা ঠিক হবে না।

—আমারও তাই মনে হচ্ছে। লোকজনের যাতায়াতও প্রায় বন্ধ হয়ে এল।

নীরা বলিল, কি সাংঘাতিক অন্যায় বলুন দেখি?

—তাই তো দেখছি! আচ্ছা, তাহলে আপনি বসুন। আমি উঠছি।

—না, না। এই রাত্রে, এই অন্ধকারে, আমাকে একা ফেলে যাবেন না। আমার ভীষণ ভয় করবে।

—ভয় কি? এখনও পথে লোক-চলা একেবারে বন্ধ হয় নি। ভয়ের আর কি আছে? আপনি বসুন, আমি আসি।

—না, না, আপনি যাবেন না। আর একটু বসুন, আমিও যাব। কতক্ষণ আর অপেক্ষা করব, বলুন। আচ্ছা, এর কি কোন প্রতিকার নেই? এই অন্যায়ের?

অবনী বলিল, আমিও তাই ভাবছি। এর প্রতিশোধ আমি নেবই নেব।

—আমিও বলছি, এর প্রতিশোধ আমি নেব।

চটাস।

অবনী নীরার গালে একটু মৃদু চড় বসাইয়া দিল।

নীরা বিস্মিত হইয়া বলিল, হঠাৎ ও কি করলেন?

—এত বড় একটা মশা।

—মরেছে?

—হ্যাঁ, এই দেখুন।

নীরা দেখিল, অবনীর একটা আঙুলে একটা মরা মশা এবং তার সঙ্গে একটু রক্ত। নীরা বলিল, ইস আপনার হাতে রক্ত লেগে আছে, দেখছি!

এই কথা বলিয়াই নীরা ব্যাগ হইতে একখানি ছোট ছাপা রুমাল বাহির করিয়া অবনীর আঙুলটি মুছাইয়া দিল।

অবনী বলিল, ধন্যবাদ! ইস, আপনার গালেও দেখছি রক্ত লেগে রয়েছে।

এই কথা বলিয়াই অবনী পকেট হইতে একটি ধবধবে রুমাল বাহির করিয়া আলগোছে নীরার গালের রক্ত মুছিয়া দিল।

নীরা বলিল, ধন্যবাদ। কিন্তু আপনার রুমালখানা যে নোংরা হয়ে গেল?

অবনী বলিল, নোংরা হয়ে গেল, না, ধন্য হয়ে গেল?

যান, কি যে বলেন আপনি।

একটুক্ষণ উভয়েই চুপ।

নীরা ঠাস করিয়া বাঁ পায়ের নীচের দিকে একটা চড় বসাইয়া দিয়া বলিল, আর না। আমি এখন চললুম। নমস্কার।

অবনী বলিল, আমিও।

নীরা ও অবনী উঠিল। স্থানটি প্রায় নির্জন হইয়া গিয়াছে। খানিক দূরে একখানি গাড়ী এখনও দাঁড়াইয়া আছে। নিস্তরঙ্গ লেকের জলে উজ্জ্বল আকাশের ছায়া নামিয়াছে। দূরে রাস্তায় আলোকমালা দেখা যাইতেছে। ক্লাবের মধ্যে তীব্র আলোর রেখা দেখা যাইতেছে। একখানি মালগাড়ী গুম-গুম শব্দ করিতে

করিতে রেল-লাইনের উপর দিয়া অগ্রসর হইতেছে। এঞ্জিনের মাথা দিযা হুস্-হুস্ করিযা ধূম বাহির হইতেছে।

নীরা ও অবনী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। ক্রমশঃ তাহারা দুই লেকের মধ্যবর্তী পুলের উপর আসিযা পড়িল।

নীরা বলিল, উঃ!

অবনী ব্যস্ত হইযা জিজ্ঞাসা কবিল, কি হ'ল?

অসহ্য। এ জীবন আর আমার রাখতে ইচ্ছে নেই। এত বড অপমান। এখনই এই লেকের জলে—

তা'হলে প্রতিশোধের কি হবে?

এই হবে প্রতিশোধ।

মোটেই না। তা যদি হ'ত, তাহলে আপনাকে মশার কামড খেতে হ'ত না।

না, আমি নিশ্চযই মরব।

এই কথা বলিযা নীরা পুলের রেলিং-এর দিকে অগ্রসর হইল। অবনী খপ্ করিযা তাহার হাতখানা ধরিযা টানিযা আনিযা বলিল, ছিঃ, পাগলামি করবেন না।

ইতিমধ্যে কিছুদূর হইতে একটি লোক, বোধ হয পুলিশের লোক—উহাদিগকে লক্ষ্য করিতেছিল। লোকটি তাড়াতাড়ি ইহাদের কাছে আসিযা অবনীকে বলিল, এই, কেযা করতা হ্যায়?

অবনী বলিল, কিছু নয।

লোকটি বলিল, ইনকো হাত ধরকে টানাটানি করতা হ্যায কেন? ইনি কে?

অবনী একটি ঢোক গিলিযা বলিল, ইনি আমার জরু হ্যায।

লোকটি বলিল, জরু হ্যায না কচু হ্যায। সবাই অমন বোলতা হ্যায। শীগ্গির বাড়ী যান। নইলে—

আমরা এখুনি বাড়ী চলে যাচ্ছি।

নীরা ও অবনী অগ্রসর হইল।

নীরা বলিল, ছিঃ, ও-সব কি বললেন আপনি?

কি করি বলুন, উপায ছিল না। আপনি কোথায় যাবেন

ভবানীপুরে। আপনি?

আমি, আমি এলগিন রোডের মোড়ে নামব।

আমিও জগুবাবুর বাজারের কাছে নামব।

তাহলে ওই মোড়ের কাছেই বাসে ওঠা যাক।

সাদার্ণ এভেনিউ-এর মোড়ে আসিয়া অবনী ও নীরা বাসের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। দুইজনেই কেমন যেন উন্মনা। কেহই কোন কথা বলিতেছে না। আশে-পাশের গাড়ী, মানুষ, রিক্‌শা প্রভৃতি কিছুই যেন তাহারা দেখিতে পাইতেছে না। একটু পরে বাস আসিল। তাহারাও বাসে উঠিয়া পড়িল। অবনী যেখানে বসিল, ঠিক তাহার পিছনে বসিল নীরা। কাহারও মুখে কোন কথা নাই। শুধু তিন চার মিনিট অন্তর এক-একটা দীর্ঘশ্বাস! বাস সাদার্ণ এভেনিউ ছাড়িয়া শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোডে পড়িল, তার পর আশুতোষ মুখার্জি রোড। বিজলী সিনেমার সম্মুখে আসিযা তাহারা দেখিতে পাইল, সন্ধ্যার 'শো' শেষ হওয়ায় দলে দলে লোক বাহির হইতেছে। তাহারই মধ্যে একটি যুবক ও একটি যুবতী পাশাপাশি হাসিতে হাসিতে এবং প্রায় নাচিতে নাচিতে বাহির হইয়া আসিতেছে। অবনী ঘাড ফিরাইয়া নীরাকে চুপি চপি বলিল, ঐ যে বেগুণী রং-এর পাডের শাড়ী-পরা মেয়েটি, ওরই জন্য আমি লেকের ধারে অপেক্ষা করছিলাম!

নীরাও মৃদুস্বরে বলিল, আর ওঁর সঙ্গে যিনি, ওঁরই জন্য আমি বসে বসে মশার কাঁমড খাচ্ছিলাম।

দুই জনেই এক একটি ছোট দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিযা চুপ করিয়া রহিল। বাস-ভরা লোকের মাঝে আর কি-ই বা করা যায়! বাস জগুবাবুর বাজারে নিকট আসিতেই নীরা নামিবা পড়িল। নামিযাই দেখিতে পাইল. অবনীও তাহার পিছনে নামিযা পডিযাছে।

নীরা বলিল, আপনি এখানে নামলেন কেন?

মানে, আপনার সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে।

কি ব্যাপার?

মানে, সেই প্রতিশোধের কথা। দেখলেন তো স্বচক্ষে?

দেখলাম্ তো।

অবনী বলিল, আমার ইচ্ছে, আজই এর প্রতিশোধ নেওয়া হোক।

আমিও তাই ভাবছিলাম। কিন্তু আজই?

হ্যাঁ, আজই, এখনই।

এখনই যাবেন ওদের সঙ্গে মারামারি করতে?

মারামারি কেন করব?

তবে কি করবেন? কি করে প্রতিশোধ নেবেন?

সে ভার আমার। আপনি 'হ্যাঁ' বললেই আর সব ব্যবস্থা আমিই করব।

নীরা মাথা নাচু কারয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অবনী বলিল, আস্থন।

তাহারা ফুটপাথের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। এবং একটু পরেই একখানি বেবী ট্যাক্সি পাইয়া তাহাতে উঠিয়া বসিল। অবনী ড্রাইভারকে বলিল, কালীঘাটের মন্দির।

মন্দিরের আশে-পাশে এত রাত্রে লোকজন বেশি নাই। এদিক্-ওদিক্ চাহিয়া একস্থানে তাহারা দেখিতে পাইল, একটি লোক জীর্ণ বস্ত্রাদি গায়ে জড়াইয়া একখানি কম্বলের আসনের উপর বসিয়া আছে। হাতে একটি লম্বা কলকে। অবনীকে দেখিয়া লোকটি বলিল, কি ভায়া, অভ্যেস আছে না কি? কিন্তু চেহারা দেখে তো সে রকম মনে হচ্ছে না?

অবনী বলিল, না। ওসব নয়। তবে—

তবে কি?

একটি পুরুত চাই। কোথায় পাব, বলতে পার?

পারি বই কি—বলিয়া তাহার ডান হাতটা অবনীর সম্মুখে মেলিয়া ধরিল। অবনী একটি টাকা তাহার হাতে দিল। লোকটি উঠিয়া উহাদিগকে বলিল, এস আমার সঙ্গে।

একটি গলির মধ্যে ছোট একখানি বাড়ীর দরজা দেখাইয়া দিয়া লোকটি চলিয়া গেল। অবনী ও নীরা দরজার কাছে গিয়া কড়া নাড়িতেই একটি বৃদ্ধ দরজা খুলিয়া দিলেন।

অবনী বলিল, আমরা একটু ভিতরে আসতে পারি?

নিশ্চয়ই, এস এস।

অবনী তাহাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে বৃদ্ধ বলিলেন, বেশ, বাবা, বেশ। এস মা, এস।

ইহাদিগকে ভিতরে লইয়া গিয়া পুরোহিত মহাশয় ও তাঁহার স্ত্রী যথারীতি ইহাদের উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। নীরা ও অবনীও ভক্তি ভাবে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া যথাসাধ্য দক্ষিণার ব্যবস্থা করিয়া ইঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইল।

পথে আসিয়া নীরা বলিল, এটা কি হ'ল?

যা হবার তাই হ'ল।

এখন কোথায় যাবে?

আমার বাড়ীতে।

সে কি হয়? বিয়ের রাত্রে ক'নের বাড়ীতে থাকতে হয়।

বেশ, তাই চল।